ECOH



https://ecohbd.org/

এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো)

Ekhlaspur Center of Health (ECOH)

এখলাসপুর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর ৩৬৪১

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১



ইকোর স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসকবৃন্দ : বাঁ থেকে ড. সোহেল রেজা চৌধুরী, ড. মোস্তফা জামান, ড. জসিমউদ্দিন আহমেদ, ডাঃ সরকার মো. নোমান, ডাঃ সাদেকুল ইসলাম



ইকোর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ : বাঁ থেকে রুহুল আমিন, তানজিলা আক্তার, ডাঃ নাহিদ সরকার, জাহিদুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, মনিরা আক্তার



ইকোর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি : বাঁ থেকে ইকবাল হোসেন, আকতার হোসেন, রেহান উদ্দিন, আবদুস সোবহান, ওবায়েদ উল্লা ও মোশারফ হোসেন।



ইকো ভবন

প্রচ্ছদ কাহিনী

ইকোর গৌরবের অন্যতম ধারক ও বাহক হলো ইকো ভবন। আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন দৃষ্টিনন্দন ভবনটির প্রবেশপথে ইকোর নামফলক বিদ্যমান। এছাড়াও প্রধান ফটক ও সীমানা প্রাচীর ২০২১ সনে নতুন ভাবে রং করার পর আরো দৃষ্টিনন্দন রূপ লাভ করেছে।

ECOH

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পর্ষদ

মোঃ মোস্তফা জামান
মোঃ কামাল উদ্দিন

সম্পাদকীয় টিম

সরকার কবির উদ্দিন, প্রধান সম্পাদক
আব্বাস ইবনে করিম, সহ সম্পাদক
নাহিদ সরকার, নির্বাহী সম্পাদক

প্রকাশক:

এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো)
এখলাসপুর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর ৩৬৪১
ফোন নং: 01766020707
Email: chandpurecoh3641@gmail.com
Facebook : ECOHfacebookgroup(EFG)
Twitter: @ecohbd
Website: https://ecohbd.org/

মে ২০২২

এই রিপোর্টে

০২ সম্পাদকের ডেস্ক থেকে সরকার কবির উদ্দিন
০৩ প্রতিষ্ঠাতার ডেস্ক থেকে মোস্তফা জামান
০৪ টেকসই ইকো কামাল উদ্দিন
০৫ প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা জাকির আহমেদ
০৬ আমাদের জামান ভাই-পল্লী স্বাস্থ্য সেবার পথিকৃত আশির আহমেদ
০৭ আমার দেখা ইকো মফিজুল ইসলাম মুন্না ঢালী
০৮ গ্রামীন স্বাস্থ্যসেবার আলোকবর্তিকা মিজানুর রহমান
০৯ এক নজরে ২০২১ সনের সেবা নাহিদ সরকার
১৪ অর্থনৈতিক রিপোর্ট ২০২১ রেহান উদ্দিন নেতা
১৫ তামাক নিয়ন্ত্রণে ইকোর সাফল্য জসিমউদ্দিন আহমেদ
১৭ স্মৃতিকথন সরকার মোঃ নোমান
১৮ উচ্চরক্তচাপ: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত সাদেকুল ইসলাম
২০ পাতে লবণ থেকে মুক্তি সোহেল রেজা চৌধুরী
২১ সাংবাদিকদের চোখে ইকো মুহাম্মদ জাকির আহমেদ ও শামসুজ্জামান ডলার
২৩ যদি মন ভাল করতে চান, ইকোতে আসুন মু. আব্বাস ইবনে করিম
২৫ আমরা মৃত্যু থেকেও শিক্ষা নেই রিজওয়ান ভুঁইয়া
২৬ ইকো হৃদরোগ–স্ট্রোক রেজিস্ট্রি মু. আব্বাস ইবনে করিম
২৮ গর্ভবতীরা কেমন ছিলেন রাজিব মন্ডল
২৯ এখলাসপুরের জনসংখ্যা নাহিদ সরকার
৩১ বহি:বিভাগে আমাদের অতিথিরা নাহিদ সরকার
৩২ হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করুন মোস্তফা জামান
৩৪ স্মৃতির খাতায় এটিএম সানাউল বাশার
৩৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের চোখে দেখা ইকো পলাশ চন্দ্র বনিক
৩৭ তৃণমূলে স্বাস্থ্য সচেতনতা পথিকৃত সরকার কবির উদ্দিন
৩৮ আদর্শ গ্রাম ও স্কুল মাসুদ আহমেদ
৩৯ বাতজ্বর নিয়ন্ত্রণ মোস্তফা জামান
৪০ মাতৃস্বাস্থ্য সেবা কাওসার পারভীন
৪১ ইকো এবং আমরা আলাউদ্দিন
৪২ মিসাতো ও এখলাসপুরের সেতুবন্ধন তুষার কান্তি দাস
৪৪ গরীবের বন্ধু ইকো আব্দুল্লাহ আল মামুন
৪৫ প্রারম্ভিক ঘটনাপঞ্জী
৪৭ ছবি কথা বলে

সম্পাদকের ডেস্ক থেকে



চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলাটি একসময় বৃহত্তর মতলব উপজেলার অংশ ছিল। তখন এ অঞ্চলটি মতলবের উত্তর এলাকা বলে পরিচিত ছিল। আজকের মতলব উত্তর উপজেলা অতীতে ভৌগোলিক ভাবে বেশ নীচু ও চতুর্পাশে মেঘনা এবং এর শাখানদী ধনাগোদা দ্বারা বেষ্টিত ছিল বিধায় সড়কপথে জেলা সদর এবং মূলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে যুগের পর যুগ। সে সময় বর্ষাকালে নৌকা এবং শুষ্ক মওসুমে পদব্রজে যাতায়াত ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থার এ দৈন্যদশায় মানুষের প্রতিটি মৌলিক চাহিদা চরমভাবে বাঁধাগ্রস্থ হয়। উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে পিছিয়ে পড়ে মতলব উত্তরের মানুষ। বিশেষ করে শিক্ষা এবং চিকিৎসা খাত চরমভাবে অবহেলিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতায় মুমূর্ষু রোগীরা জেলা বা উপজেলা সদরের হাসপাতালে যেতে না পেরে তকদিরের উপর নির্ভর করে স্থানীয় হাঁতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজ, ওঝার তথাকথিত চিকিৎসার নামে অপচিকিৎসার শিকার হয়ে নির্মম মৃত্যুকে বরণ করে নিতো। নৌকায় করে উপজেলা সদর হাসপাতালে যেতে ৪/৫ ঘন্টা লাগতো, ফলে মুমূর্ষু রোগীদের সুচিকিৎসা পাওয়া কঠিন তো বটেই এমনকি অসম্ভব ছিল।

১৯৯০ সালে বেড়িবাঁধ পূর্ণভাবে নির্মিত হওয়ার পর এ অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসে আমূল পরিবর্তন। প্রতিটি গ্রামের সাথে উপজেলা এবং জেলা শহরের সংযোগ সড়ক নির্মিত হয়। এমনকি স্থাপিত হয় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা সরকারি হাসপাতাল। প্রতিটি ইউনিয়নে স্থাপিত হয় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এছাড়া আরো নির্মিত হয় কমিউনিটি ক্লিনিক। চিরকালীন অভ্যাস, কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার কারণে মানুষ তখনো সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা, প্রসূতি সেবা, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, কুকুরের কামড়, সর্পদংশন সহ বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির নিরাময়ের জন্য সেই ঝাড়ফুঁক, পানিপড়া, তাবিজ-কবচের উপরেই নির্ভর করে থাকে। ফলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ বিশেষজ্ঞ এমবিবিএস চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে অভ্যস্ত হয় না স্থানীয় উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসকের অপ্রতুলতার কারণে। এমনকি দক্ষ প্যারামেডিক চিকিৎসকের অভাবে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলো চলে খুড়িয়ে খুড়িয়ে। বন্ধ থাকে কমিউনিটি ক্লিনিক গুলো। এমতাবস্থায় ১৯৯৯ সালে এলাকার সন্তান ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ড. মোঃ মোস্তফা জামান সাহেবের একক উদ্যোগে এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের একপাশে এক চমৎকার লোকেশনে গড়ে উঠে একটি আধুনিক ও সার্বক্ষণিক এমবিবিএস চিকিৎসক সমৃদ্ধ স্বাস্থ্য কেন্দ্র- এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো)। এলাকার প্রতি ভালোবাসা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি এই উচ্চাভিলাসী প্রকল্পে হাত দেন। শুরুতে অনেকেই ইকোর টিকে থাকা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। মতলব উত্তর শুধু নয়, সারাবাংলার অজপাড়াগাঁয় নিয়মিত এমবিবিএস চিকিৎসক সমৃদ্ধ হাসপাতাল নির্মাণে ইকো অবশ্যই অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। নিয়মিত চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি আজকে ইকো আধুনিক রোগ নির্ণয়ে তৃণমূলে নিয়ে এসেছে আধুনিক ও বিশ্বমানের যন্ত্রপাতি। এখানে নিয়মিত ল্যাব টেস্টের পাশাপাশি আল্ট্রাসনোগ্রাম অক্সিজেন প্লান্টসহ নানান আধুনিক ইকুইপমেন্টের সমাহার ঘটানো হয়েছে।

প্রেসক্রিপশন পদ্ধতিতে এনেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। হাতে লেখা মান্ধাতার আমলের প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি ছেড়ে ইকো প্রবেশ করেছে আধুনিকতার যুগে। সকল প্রেসক্রিপশন কম্পিউটারাইজড। সমগ্র জেলায় এক্ষেত্রে ইকো পথিকৃৎ। প্রেসক্রিপশন হারানোর ভয় নেই। সকল রেকর্ড কম্পিউটারে জমা থাকে। আবাসিক চিকিৎসক কি ধরনের সেবা দেয়, কি মানের ঔষধ লিখে তা নিয়মিত মনিটরিং করে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে তার পরিমার্জন করে থাকে কর্তৃপক্ষ।

সর্পদংশন, জলাতঙ্ক, করোনা সহ সামাজিক স্বাস্থ্য সেবায় আতঙ্কিত না হয়ে প্রাথমিকভাবে কী করনীয় এ ব্যাপারে ইকো তার আওতাধীন এলাকার স্বেচ্ছাসেবক, পল্লী চিকিৎসক, শিক্ষক, শিক্ষিত যুবকদের মোটিভেট করতে নিয়মিত সেমিনার, জুম মিটিং ইত্যাদি করে থাকে।

দীর্ঘ দুই দশক এহেন একটি প্রতিষ্ঠান কে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলা অনায়াস চাট্টিখানি কথা নয়। এই অসম্ভব কঠিন কাজটি এলাকার প্রতি একবুক ভালোবাসা ও পরম মমতায় চালিয়ে গেছেন এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মোঃ মোস্তফা জামান সাহেব। তাঁর কিছু নিকট বন্ধুজনরা তাঁর এই মহৎ কাজের সারথী হয়েছেন। এখন প্রতি দিনই নতুন নতুন স্বাস্থ্য সেবার চ্যালেঞ্জ হাজির হচ্ছে। চিকিৎসা সেবার মান ধরে রাখতে এবং ক্রমবর্ধমান রোগীর মানসম্মত সেবা চলমান রাখার জন্য প্রয়োজন অধিকতর তহবিলের। এখন সময় এসেছে এলাকার দানশীল ও বিত্তশালী মানুষের ইকোর জন্য কিছু করার। ড. মোঃ মোস্তফা জামান সাহেবের একক দায়িত্বের বন্ধনকে একটু আলগা করে তাঁকে স্বস্তি দেওয়ার। কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই করতে হলে চাই সার্বজনীন সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা। এলাকার হৃদয়বান ও ধনাঢ্য মানুষেরা যদি তাদের সদকায়ে জারিয়া, জাকাতের কিছু অংশ ইকোর তহবিলে দান করেন তাহলে আর কিছু হোক না হোক ইকো তাঁর চলমান স্বাস্থ্যসেবার মান শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি করে টিকে থাকবে যুগের পর যুগ এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায়।

সরকার কবির উদ্দিন
গণসংযোগ সম্পাদক

প্রতিষ্ঠাতার ডেস্ক থেকে



দেখতে দেখতে বাইশ বছর পার হলো। ক্রমশ সুদৃঢ় হলো ইকোর অবস্থান। ভৌত অবকাঠামো, যন্ত্রপাতির সাথে সাথে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী তৈরী হলো। গতানুগতিক চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে অনলাইন ব্যবস্থাপত্র তৈরীর সফটওয়্যারে কাজ শুরু হলো। পেপার-পেন্সিল জরিপ পদ্ধতির বদলে ট্যাব-ভিত্তিক অনলাইন জরিপ শুরু হলো। সেখান থেকে শুরু তৈরী হলো হৃদরোগ স্ট্রোকের মত রোগের রেজিস্ট্রি । সাথে সাথে উচ্চরক্তচাপ ও বহুমূত্রের তালিকাও হালনাগাদ হলো। অবারিত হলো গর্ভবতীদের সেবার আধুনিকায়ন। ফিটাল হার্ট মনিটর ও আল্ট্রাসনোগ্রাফি যুক্ত হলো। এই সকল সেবা প্রদান করা হলো প্রায় বিনা মূল্যে।

আজকের অবস্থানে আসা একদম সহজ কাজ ছিল না। অনেক সামাজিক প্রতিকুলতাকে হার মানিয়ে মাথা উচু করে দাড়ানো সম্ভব হয়েছে। কারন সাথে ছিলেন কিছু সুহৃদ বন্ধুবান্ধব। এখলাসপুরের কয়েকজন গন্যমান্য ব্যক্তি সবসময় পাশে ছিলেন। বিশেষ করে আমার এসএসসি পঁচাত্তর ব্যাচের বন্ধুরা মানসিক ও অর্থনৈতিক ভরসা দিয়েছেন। তাই করোনা অতিমারীর সময়ও আমাদের সেবা বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ব্যবহার করে অনেকের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। অনেকের কষ্ট লাঘব করা গেছে।

ইকোর অগ্রযাত্রা টেকসই করার জন্য একটা ট্রাস্ট গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে। আশা করি সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে আসবেন। পরিশেষে ইকোর সকল শুভানুধ্যায়ী ও সাহায্যকারিকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

ড. মোস্তফা জামান



১৯৯৯ সনের ৮ মে মিসাও ইয়ানো ও মোস্তফা জামান আলিঙ্গন করছেন ইকো উদ্বোধনের পর

টেকসই ইকো



আমার ও মোস্তফা জামানের বন্ধুত্ব স্কুল জীবন থেকে। কখনো সে বন্ধুত্বের ঘাটতি দেখা দেয়নি। নিরানব্বই সনে ইকোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম আরো অনেকের সাথে। মনে কিছুটা দ্বিধা কাজ করছিল। এমন অজ পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার থাকবে কিনা? মোস্তফা জামানই বা নিজের পেশাগত জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে এখানে সময় দিতে পারবে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি অবাক হয়েছি এই দেখে যে ডাক্তার সাহেব প্রতি মাসের একই দিনে এখলাসপুর এসে হাজির হয়েছেন। ঝড় বাদলও তাকে থামাতে পারেনি। দুই যুগেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তার বাবা-মা বেঁচে থাকলেও বুঝতাম যে তাদের আকর্ষনে গ্রামে যান। তাঁরা সাতানব্বই সনেই পরলোকগমন করেছেন। ডাক্তার সাহেবের একমাত্র আকর্ষন ইকো ও এখলাসপুর তথা মতলবের জনগন। তারমত একজন নিবেদিত প্রান চিকিৎসা-সমাজকর্মীর পক্ষেই এমন একটি জটিল কিন্তু মহতী উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। কোন প্রকার সরকারী অর্থায়ন ছাড়াই ইকো এগিয়ে চলছে।

আমরা পঁচাত্তর ব্যাচের বন্ধুরা এর সাথে ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকব ইনশাআল্লাহ্। ইকোর অর্থনৈতিক ভিত্তি হবে আরো টেকসই। একটি ট্রাস্ট ফান্ড তৈরীর কাজ চলছে। আশা করছি সহসাই এখলাসপুরবাসীর জন্য সুখবর দিতে পারব।

ইকোর উত্তর উত্তর সাফল্য কামনা করি।

মোঃ কামাল উদ্দিন
শিল্পপতি ও সমাজসেবক
সভাপতি
এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি



এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯৭৫ ব্যাচের বন্ধুরা

প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা



এখলাসপুর সেন্টার অফ হেল্‌থ (ইকো)'র প্রতিষ্ঠাকালে গ্রামীণ মানুষের জন্য এখলাসপুরে একটি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান জরুরি মনে করলেও তার বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব তা কল্পনায়ও আনতে পারিনি। অধ্যাপক ড. মোস্তফা জামানের হাত ধরে গড়ে ওঠে এখলাসপুর সেন্টার অফ হেল্‌থ (ইকো)।

কালক্রমে সকলের সহযোগিতায় আজ পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবায় এক বাগান তৈরি হয়েছে। অবাক হই, গ্রামে বসবাসরত মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় নিয়ামক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইকো'র এমন সফল আত্মপ্রকাশ দেখে। খুশি হই, যখন গ্রামের মানুষজনের মুখে মুখে ইকো'র প্রশংসা শুনি ও বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য সেবায় তুষ্ট হয়ে রোগীকে বাড়ি ফিরতে দেখি।

ইকো এখন অনেক পরিনত ও সকল শ্রেণির মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ জীবনে এটি অনেক বড় পাওয়া ও পরিতুষ্টির যায়গা। 'ইকো' স্বাস্থ্য সেবা সুলভ করেছে এবং বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করেছে। নিঃসন্দেহে 'ইকো গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবায় এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আশাকরছি, পর্যায়ক্রমে আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ সেবার সমন্বয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশের পাশাপাশি বহুমুখী সামাজিক কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবেও অবদান রাখবে। ইকোর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও সেবা গ্রহীতাদের জন্য শুভ কামনা রইল।

জাকির আহমেদ
এ্যাডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং
সাবেক অধ্যক্ষ
মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, ঢাকা।



আমাদের আরেক অহংকার, এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়

আমাদের জামান ভাই– পল্লীস্বাস্থ্যসেবার পথিকৃৎ



আমার ছোটবেলা কেটেছে এখলাসপুরে। ডাক্তার বলতে আবুল ডাক্তার ছিলেন আমাদের সবার প্রিয় সবার শ্রদ্ধাভাজন। আমি নিশ্চিত এখলাসপুরের মোটামুটি সব পরিবার ওনার প্রতি কৃতজ্ঞ। ছোটবেলায় শুভাকাঙ্খীরা জিজ্ঞাস করতেন, "বাবু, ভবিষ্যতে কি হতে চাও?" আমি উত্তর দিতাম, "ডাক্তার"। এই উত্তরে বাবা-মা সবাই খুশি হতেন। খুশি হতাম না শুধু আমি। কারণ জানেন? ১৯৭৯ সাল হবে সম্ভবত। জামান ভাই তখন চট্রগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। ছুটিতে বাড়িতে এসেছেন। নিয়ে এসেছেন মানুষের কঙ্কালের এক অংশ। হামযা জেঠা (জামান ভাইয়ের বাবা) এসে বললেন, "বাবু, তুই তো ডাক্তার হবি, আয় মানুষের হাড্ডি দেখে যা"। আমি উকি মেরে দেখলাম। আগ্রহ জন্মাল না। যা জন্মাল তা হচ্ছে ভয়। আমি এক দৌড়ে ঘরে ফিরলাম।

ছোটবেলায় পড়াশুনা না করলে, আম্মা বলতেন দ্যাখ ঐ বাড়ির জামান কীভাবে সারাদিন পড়াশুনা করে। পড়াশুনা না করলে ডাক্তার হবি কি করে? আমি জামান ভাইয়ের মত পড়াশুনা করতে রাজি আছি। কিন্তু ডাক্তার হতে রাজি না। ১৯৮৫ সালে ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। দ্বিতীয় বর্ষে এসে বায়োলজি পরিবর্তন করে পরিসংখ্যান নিলাম। ডাক্তার হবার পথটুকু নিজ হাতে বন্ধ করে দিলাম। বাবা ইঞ্জিনিয়ার, চাচা ইঞ্জিনিয়ার, কাজিন ইঞ্জিনিয়ার। জিনে হয়তো তাই লেখা ছিল- আমি ও ইঞ্জিনিয়ারিং পথে পা দিয়ে বুয়েটে ভর্তি হলাম। বুয়েট ক্লাস শুরু হতেই জাপানি সরকারি এক বৃত্তি নিয়ে ১৯৮৮ সালে জাপানে এলাম।

১৯৯৩ সালে জামান ভাইয়ের সাথে দেখা হল জাপানে। উনি এসেছেন পিএইচডি করতে। একদিন ওনার ডরমিটরিতে আধাদিন আড্ডা হল। এখলাসপুরের অনেক অজানা ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হল। গ্রাম উন্নয়ন নিয়ে কথা উঠলো। আমি শুধু শ্রোতা হয়ে শুনে গেলাম। উনি যখন ডাক্তারি পাশ করে গ্রামে যেতেন, তখন মানুষের উপচে পড়া ভীড় দেখেছি। সবাই এক-আধটু সেবা পাবার লক্ষ্যে কথা বলতে আসতেন। জেঠি (জামান ভাইয়ের মা) মৃদু আহ্লাদী স্বরে বলতেন, কিরে তোরা কি ডাক্তার সাবকে ভাত খাইতে ও দিবিনা।

সম্ভবত ১৯৯৫ সালের কথা। জাপানে কয়েক দফা আড্ডা হল। একদিন বললেন, এখলাসপুরে একটা হাসপাতাল দিতে চাই। স্বাস্থ্যসেবার একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই। যে কথা সেই কাজ। এখলাসপুরে তৈরি হল এখলাসপুর সেন্টার অব হেল্‌থ যা ইকো নামে পরিচিত। গ্রামে একটা হাসপাতাল তৈরি করা চাট্টিখানি কথা নয়। সময় লাগে, টাকা লাগে- ভালো সঙ্গী লাগে। সবচেয়ে বেশি লাগে গ্রামবাসির সহযোগিতা। নাহ নাহ, সবচেয়ে বেশি লাগে ধৈর্য।

প্রবাসীদের অনেককেই দেখেছি নিজ গ্রামের জন্য কিছু একটা করার জন্য ছুটে যান। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে গ্রামের একটা অর্জনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। জনসেবা করতে গেলে মানুষ কত কিছু ওলট পালট গুজব ছড়ায়। উৎসাহের চেয়ে নিরুৎসাহের পাল্লা ভারী হতে থাকে। একসময় সব ছেড়ে দিয়ে গ্রাম-বিমুখী হয়ে ওঠেন। জামান ভাই হয়তো ভাগ্যবান। এখলাসপুর গ্রামবাসীদের মত ভাল মানুষ পেয়েছেন। অথবা ধৈর্য নিয়ে সহ্য করে গেছেন। আমি বলবো এখলাসপুরবাসিরা অনেক ভাগ্যবান। জামান ভাইয়ের এক ঘণ্টা সময়ের মূল্য ঢাকায় একরকম, বিশ্বে একরকম। এখলাসপুরে অন্যরকম। জীবনের যে সময়টুকু আপনি এখলাসপুরের জন্য দিয়েছেন এখলাসপুরে যে কোয়ালিটি ডাক্তারদের নিয়ে সেবা দিয়েছেন তা আমাদের অন্তরে খোদিত হয়ে আছে, থাকবে বাংলাদেশে আরো ৮৫ হাজার গ্রাম আছে। বিশ্বের গবেষণাপত্র গুলোতে মাঝে মাঝে যখন এখলাসপুর এবং জামান ভাইয়ের নাম দেখতে পাই, তখন অন্তর বলতে থাকে ইয়েস এটা আমাদের গ্রাম এবং জামান ভাইকে আমি বাল্যকাল থেকেই চিনি।

ড. আশির আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক
কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান।



জামান ভাইয়ের পৈত্রিক ভিটার সামনে দাড়ানো জামান ভাই ও মিসাও ইয়ানো, ছবিটি ৮ মে ১৯৯৯ তারিখে তোলা।

আমার দেখা ইকো



ভয়ংকর মেঘনার করাল গ্রাসে আমাদের ইউনিয়নের সিংহভাগ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। এতদঞ্চলে লোকজন সব কিছু হারিয়ে অসহায় ও মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছিল। এক সময়ের প্রভাবশালী ও বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক নিমিষেই নিঃস্ব হয়ে মাথাগোঁজার ঠাঁই হারিয়ে ফেলেন। অবশিষ্ট জায়গাতে বিশাল জনগোষ্ঠী শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান, ও চিকিৎসার অভাবে মানবেতর জীবন যাপন অতিবাহিত করতে লাগল। বিশেষত চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এ অবস্থা থেকে নিঃস্ব ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার লক্ষে অত্র ইউনিয়নের কৃতিসন্তান ড. মোস্তফা জামান সাহেব ও তাঁর জাপানী বন্ধু মিঃ মিসাও ইয়ানোকে নিয়ে ১৯৯৯ইং সালের ৮ই মে গড়ে তোলেন এখলাসপুর সেন্টার অফ হেল্‌থ (ECOH)। মতলব তথা চাঁদপুরের সাধারণ মানুষ প্রায় বিনা খরচে পেয়েছে চিকিৎসার সু-ব্যবস্থা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীরা যাতে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সেই জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পাশাপাশি অত্যাধুনিক ল্যাব গড়ে তুলেছেন। এখানে প্রায় ২১ ধরনের রোগের পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বের চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে অত্র হাসপাতালটিকে উন্নত থেকে উন্নততর করেছেন। ড. মোস্তফা জামান সাহেব তার মেধা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে মানব সেবার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অসহায় মানবগোষ্ঠীর জন্য তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মানব সেবার এই নির্দেশন ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

পরিশেষে আমি আমাদের তথা চাঁদপুরের এই কৃতিসন্তানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কমনা করি।

মফিজুল ইসলাম মুন্না ঢালী
চেয়ারম্যান
৮নং এখলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ
সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কমনা করি।



বাঁদিকে ইউনিয়ন পরিষদ, ডানদিকে ইকো,
আর সামনে স্কুলের খেলার মাঠ।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার আলোকবর্তিকা



এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে প্রায় ছয় বছরের চাকুরী জীবনে এখলাসপুরকে নিজের করে নিয়েছি। অধিকন্তু আমার সহধর্মিনীর পৈত্রিক নিবাসও এখলাসপুর। যে কারনে প্রায় দুই যুগ আগে থেকেই এখলাসপুরের সাথে আমার নিবিড় যোগাযোগ। আমার স্কুলের প্রায় গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে 'এখলাসপুর সেন্টার অফ হেল্‌থ' বা 'ইকো'। সুতরাং ইকো'র জন্মলগ থেকেই এর কর্মকান্ড ও সেবা সর্ম্পকে আমি সম্যক অবগত।

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইকো এই অজোপাড়া গাঁয়ে আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। যে সময় গ্রামের মানুষ আধুনিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণে চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকার মতো বড় শহরে না গিয়ে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার আশাই করতে পারত না সেই সময়ে এখলাসপুরের ইকো হাসপাতালে প্রায় বিনামূল্যে এলাকাবাসী বিশেষজ্ঞ এমবিবিএস চিকিৎসক দ্বারা বিশ্ব মানের চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

এলএমএফ চিকিৎসক, কবিরাজ, ওঝা বৈদ্যের হাতুড়ে চিকিৎসা, ঝাড় ফুক ইত্যাদিতে অভ্যস্থ মানুষ কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আধুনিক চিকিৎসা সেবার নাগাল পেলো ইকোর কল্যাণে। তাই, ইকো এতদঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসার এক আলোকবর্তিকা।

ইকো আমার প্রতিবেশী। আমি প্রতিনিয়ত অবলোকন করে চলেছি। ইকো কি করে দিন দিন মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করে চিকিৎসা বান্ধব হয়ে উঠেছে সেই দৃশ্যের! ইকো প্রতিদিনই নিজেকে আপডেট করার জন্য যা করার তাই করে যাচ্ছে। যে কোন স্বাস্থ্য সমস্যা সর্ম্পকে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে ইকো নিয়মিত আয়োজন করে চলেছে বিজ্ঞানসম্মত সেমিনার। আর্থিক যোগান চলমান রাখার জন্য এর প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় ড. মোস্তফা জামান (এমবিবিএস, এমপিএইচ, পিএইচডি) এর কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিকতার কথা না বললেই নয়। আল্লাহ পাক স্যারকে দীর্ঘজীবি করুন।

আমার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং ইকো বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ইকো একটি ভরসার নাম। তাই আমি এলাকার বিত্তশালী ও সহৃদয় অভিভাবক সমাজ এবং সাবেক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের প্রতি উদার আহবান করছি, ইকোর এই এগিয়ে চলাকে টেকসই রাখতে আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিন। একই সাথে ইকোর আধুনিক চিকিৎসা সেবার প্রতি জনগনকে সচেতন করতে প্রচার প্রচারণা করার জন্য ও আমি ইকো সংশ্লিষ্ট সূধীজনদের প্রতি সবিনয় অনুরোধ করছি।

মোঃ মিজানুর রহমান
প্রধান শিক্ষক
এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়
মতলব উত্তর, চাঁদপুর।



ইকো ভবন সংলগ্ন মাঠে এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছে।

এক নজরে ২০২১ সনের সেবা

ডাঃ মোঃ নাহিদ সরকার



করোনা অতিমারীর মধ্যেও ইকো তার কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। লঞ্চ চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও অনলাইনে রুগী দেখা চলমান ছিল।

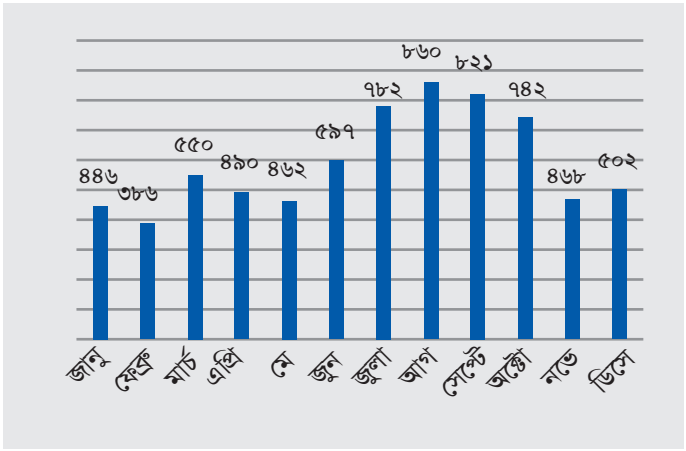
বর্হিবিভাগ ঃ

বর্হিবিভাগ ইকোর সেবাদানের মূলস্তম্ভ। সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৮.৩০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান। মূলত বর্হিবিভাগে এমবিবিএস চিকিৎসক দ্বারা সব ধরনের রোগীদের সেবা দেওয়া হয়। তবে কোনো রোগীর বিশেষজ্ঞ সেবার প্রয়োজন হলে রেফারেল সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিমাসের প্রথম শুক্রবার রোগীদের সে সেবাটি দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে ২০২১ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত রোগী দেখার ফি ছিলো এমবিবিএস চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে ২০ টাকা এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে ৪০ টাকা। ক্ষেত্রবিশেষে কোন রোগী ফি পরিশোধে অক্ষম হলে ফি মওকুফের বিধান ও রয়েছে

২০২১ সনে রোগীর উপস্থিতি ঃ

এলাকাভিত্তিক ঃ

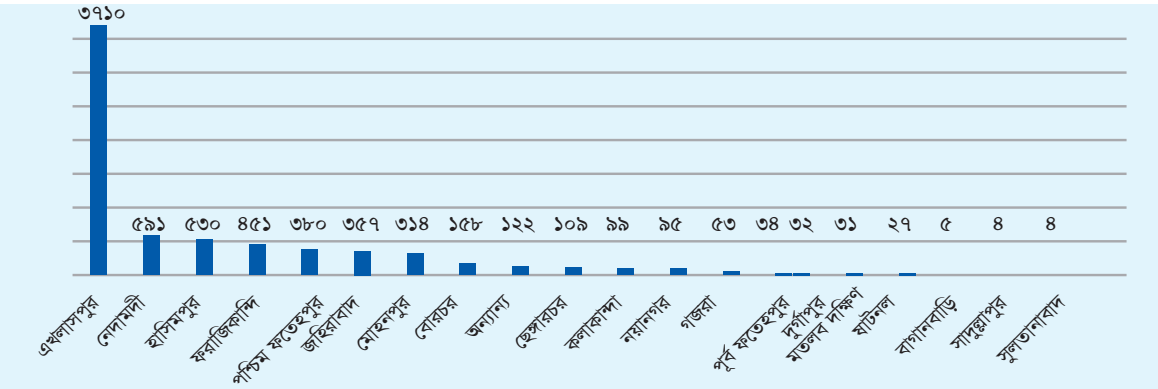
২০২১ সনে ইকোতে উপস্থিত রোগী এলাকাভিত্তিক একটি তালিকা নিম্নে দেখানো হয়েছে। এতে দেখতে পাওয়া যায় মোট রোগীর সংখ্যা ৭১০৬ জন। তন্মধ্যে এখলাসপুর গ্রাম থেকে সর্বোচ্চ ৩৭১০ জন রোগী এসেছে। তার পাশাপাশি সংলগ্ন এলাকা নেদামদী ও হাসিমপুর থেকে ২য় ও ৩য় সর্বোচ্চ রোগী যথাক্রমে ৫৯১ জন ও ৫৩০ জন রোগী এসেছে। এছাড়াও ফরাজিকান্দি, পশ্চিম ফতেহপুর ও জহিরাবাদ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রোগীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।



২০২১ সনে ইকোতে উপস্থিত রোগীদের মাসভিত্তিক শ্রেনিবিন্যাস

মাসভিত্তিক ঃ

২০২১ সনে রোগীদের উপস্থিতির একটি মাসভিত্তিক শ্রেনিবিন্যাস দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করা যায় আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ ৮৬০ জন রোগী এসেছে। এবং সেপ্টেম্বর, জুলাই ও অক্টোবর মাসে যথাক্রমে ৮২১, ৭৮২ ও ৭৪২ জন রোগীর উপস্থিতি দেখা গেছে। বিপরীতে ফেব্রুয়ারী ও জানুয়ারী মাসে সর্বনিম্ন ৩৮৬ ও ৪৪৬ জন রোগী উপস্থিত হয়েছে।



২০২১ সনে ইকোতে উপস্থিত রোগীদের এলাকাভিত্তিক শ্রেনিবিন্যাস

** অন্যান্য দ্বারা মূলত ঢাকা, কুমিল্লা, চাঁদপুর ইত্যাদি এলাকা থেকে আগত রোগীদের বোঝানো হয়েছে।

গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যসেবা ঃ

ইকো এখলাসপুরের গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে

* ২০২১ সনে সেবা নিয়েছেন ৩৬ জন। এদের প্রায় সবাই তিনটি ভিজিট সম্পন্ন করেছেন।
* যেসব সেবা দেয়া হচ্ছেঃ
  -স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং, গ্লুকোজ, হিমোগোবিন, প্রশ্রাব পরীক্ষা
  -বিনামূল্যে আল্ট্রাসনোগ্রাফী



আধুনিক ডপলার মেশিনের সাহায্যে ভ্রুণের হৃদস্পন্দন নির্ণয়

সিভিডি ক্লিনিক ঃ

ইকো পরিচালনা করে আসছে সিভিডি ক্লিনিক। এই ক্লিনিক প্রতি শনিবারে পরিচালিত হয়। রেজিস্ট্রিভুক্ত রোগীদের আগে থেকে যোগাযোগ করে এদিন সকালে এনে পরীক্ষা করে বিনামূল্যে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রদান করা হয়। মূলত এ ক্লিনিকে যে ধরনের রোগীরা সেবা পায় সেগুলো হলোঃ ১. স্ট্রোক ২. হৃদরোগ ৩. ডায়াবেটিস ও ৪. উচ্চ রক্তচাপ।

রোগীর তালিকা নিম্নরুপ ঃ

নিবন্ধিত মোট রোগীর সংখ্যা	১৯২
স্ট্রোক	১৮
হৃদরোগ	২৫
উচ্চ রক্তচাপ	১০৩
ডায়াবেটিস	৩১

এছাড়াও ইকো এই ক্লিনিকে স্ট্রোক থেকে উদ্ভুত পক্ষাঘাতের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও ইনফ্রারেড থেরাপিসহ ফিজিওথেরাপি দিয়ে থাকে।



সিভিডি ক্লিনিকের রোগীকে সেবা দেয়া হচ্ছে।

নেবুলাইজেশন ঃ

শ্বাসকষ্টের মতো জরুরী রোগীদের জন্য ইকোতে রয়েছে নেবুলাইজেশন সেবা। ইকোর অফিসকালীন সময়ে (সোমবার থেকে শনিবার, সকাল ৮:৩০ থেকে বিকাল ৪:৩০) অত্যন্ত স্বপ্নমূল্যে এ সেবা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে (৩০ টাকা)।
২০২১ সনে এ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৯২ জন।

পুরুষ : ২৪ জন
মহিলা : ৬৮ জন
অনুর্ধ্ব-১৮: ৩৬ জন।



শ্বাসকষ্টের একজন রোগীকে নেবুলাইজেশন দেয়া হচ্ছে

ইনফ্রারেড থেরাপী ঃ

বাতের ব্যথাসহ বিভিন্ন শারীরিক ব্যথায় ইনফ্রারেড থেরাপী ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও স্ট্রোকসৃষ্ট পক্ষাঘাতেও এ থেরাপীর বহুল বাবহার রয়েছে। ইকোতে নিয়মিতভাবে (সোমবার থেকে শনিবার, সকাল ৮:৩০ থেকে বিকাল ৪:৩০) এ সেবা বিদ্যমান। এ সব সেবা ৩০ টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয়েছে।



২০২১ সনে এ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ ৬১ জন

অক্সিজেন কনসেনট্রেটর সংযোজন ঃ

করোনা মহামারী ২০২১ সনে পূর্বের চেয়ে আরো ভয়ানক রুপ নেয়। এ ভয়াল থাবা থেকে এখলাসপুরও রক্ষা পায়নি। করোনাক্রান্ত রোগীদের সাধাণত ফুসফুসে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়। এছাড়াও যাদের শ্বাসকষ্ট রয়েছে তাদেরও একই সমস্যা হতে পারে। সে সমস্ত রোগীদের কথা ভেবে ২০২১ সনে ইকো সংযোজন করেছে আধুনিক অক্সিজেন কনসেনট্রেটর মেশিন।



সিভিডি ক্লিনিকের রোগীকে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে

ল্যাবরেটরীর আধুনিকায়ন ঃ

রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ জানার পাশাপাশি কখনো কখনো প্রয়োজন পড়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার। ইকো অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে এসব পরীক্ষা করে থাকে। তবে পরীক্ষা স্বল্পমূল্যে করে থাকলেও ল্যাবরেটরির আধুনিকায়নে ইকো কখনো কার্পণ্য করেনি। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সনে সংযোজিত হয়েছে নতুন সেল কাউন্টার মেশিন, আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন, নতুন ইসিজি মেশিন, হিমোগ্লোবিন মাপার মেশিন, প্রশ্রাব পরীক্ষা করার আধুনিক মেশিন।

২০২১ সনে সিবিসি পরীক্ষা হয়েছে- ৩৭৭ টি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি- ৭৩ টি, ইসিজি- ৩০৩ টি ও প্রশ্রাব পরীক্ষা- ৪৭৬ টি।



সেল কাউন্টার মেশিন

উঠান বৈঠক ঃ

এলাকার সর্বসাধারনের মাঝে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে ইকো নিয়মিতভাবে উঠান বৈঠকের আয়োজন করে থাকে। সাধারনত যেসব বিষয়বস্ত নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো হলো ঃ

* করোনা ভাইরাস জনিত সচেতনতা।
* সঠিক নিয়মে হাত ধোয়।
* পাতে লবণ না খাওয়া।
* তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতি।



স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে ইকো কর্তৃক আয়োজিত উঠান বৈঠক



আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন



প্রশ্রাব পরীক্ষা মেশিন



হিমোগ্লোবিন মাপার মেশিন



ইসিজি মেশিন

ECOH

ইপিআই কার্যক্রমে সরকারকে সহযোগীতা ঃ

ইপিআই কার্যক্রমে ইকো সবসময়ই সরকারি কর্মসূচিকে সহযোগীতা করে এসেছে। সুষ্ঠু পরিবেশে ও নির্বিঘ্নে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীগণ যাতে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন ইকো সে ব্যাপারে সচেষ্ট। এছাড়াও ইকো আলাদা ভাবে ইপিআই রেজিস্টার সংরক্ষন করে থাকে।



ইকোতে একটি শিশুকে টিকা খাওয়ানো হচ্ছে

ইকো স্বাস্থ্য জরিপ ঃ

এখানে ইকো'র স্বাস্থ্যকর্মীরা জরিপে অংশগ্রহনকারীর বাড়িতে গিয়ে কিছু প্রশ্নোত্তর নেয় এবং পরদিন অংশগ্রহনকারী ইকোতে উপস্থিত হলে বিনামূল্যে তাদের রক্তের শর্করা, চর্বি, প্রশ্রাব পরীক্ষা ও ইসিজি করা হয় এবং চিকিৎসক প্রয়োজনে তাদের চিকিৎসা প্রদান করেন। এ জরিপের মাধ্যমে অনেক অংশগ্রহনকারীরই নতুন কিছু রোগ ধরা পড়েছে যেগুলো তাদের কাছে অজানা ছিলো এবং সঠিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হচ্ছে।

জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ

মোট	:	৩২২
পুরুষ	:	১৫৭
মহিলা	:	১৬৫



ইকো স্বাস্থ্য জরিপ ইকোর নিয়মিত কাজের একটি অংশ

বৃক্ষরোপণ অভিযান ঃ

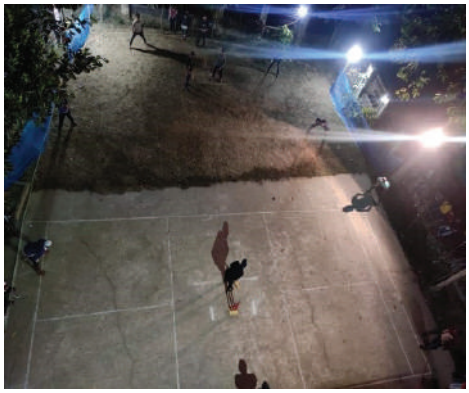
এখলাসপুরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইকোর পক্ষ থেকে ইকোর সীমানা প্রাচীর থেকে এখলাসপুর ঈদগাহের সীমানা পর্যন্ত এক সারি কৃষ্ণচূড়ার চারা রোপণ করা হয়। ১৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে ইকোর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মো. মোস্তফা জামান এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।



ওবায়েদ মাস্টার ও নাহিদ ডাক্তার গাছের চারা রোপন করেন

স্পোর্টি এখলাসপুরঃ

ইকো সবসময় সুস্বাস্থ্যকে উৎসাহিত করে। সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ও সুন্দর সমাজে বিনির্মাণে খেলাধুলার ও অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তাই ইকো বিভিন্ন সময় খেলাধুলাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সনে আয়োজিত হয় ব্যাডমিন্টন ও ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট।



ক্রিকেট টুর্নামেন্ট



ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট



ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা দেখছেন ড. মোস্তফা জামান,
চেয়ারম্যান মোসাদ্দেক হোসেন মুরাদ,
স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আবদুস সোবহান।



খেলার বিজয়ীকে পুরষ্কার প্রদান হচ্ছে। ছবিতে ডাঃ নাহিদ সরকার,
ড. মোস্তফা জামান ও ডাঃ আব্বাস ইবনে করিমকে দেখা যাচ্ছে।



২০২১ সনে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুর্ধ্ব-১৭ বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপে বিজয়ী হয় এখলাসপুর ইউনিয়ন। বিজয়ী ফুটবলারদেরকে উৎসাহিত করতে ইকোর পক্ষ থেকে অত্যন্ত উন্নত মানের ফুটবল উপহার দেয়া হয়।



তরুন প্রজন্মকে ইন্টারনেট ও মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে ২০২১ সনে ইকোতে ক্যারম খেলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক ও কিশোরদের জন্য আলাদা সময়ে খেলা আয়োজন করা হয়।



অন্যান্য কার্যক্রমের মত ইকো আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে সবসময় স্বচ্ছ। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছরই আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা হয়। আয়ের উৎস খেয়াল করলে দেখতে পাওয়া যায় ইকোর রোগী ও ল্যাব থেকে আয় অনুদান থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৬ ভাগের এক ভাগ। মূলত এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯৭৫ ব্যাচের অনুদানের মাধ্যমে এ অর্থ উঠে আসে। রোগী দেখা ও ল্যাবরেটরী আয় ও প্রায় কাছাকাছি। এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজনে যতটুক প্রয়োজন শুধুমাত্র ততোটুক পরীক্ষা করানো হয়। নিচের তালিকা খেয়াল করলে ইকোর অলাভজনক দাতব্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচয় স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠে।

বিবরণ		টাকা
ক. পূর্বের স্থিতি (৩১ ডিসেম্বর ২০২০)		৪,৬৪,২৪১/-
খ. আয়		
১.	রোগী দেখা	১,১৮,২২০/-
২.	ল্যাবরেটরি	২,৪৭,১৮৫/-
৩.	অনুদান	১৯,৩৫,৯৩০/-
	মোট আয়	২৩,০১,৩৩৫/-
গ. (ক+খ)		২৭,৬৫,৫৭৬/-
ঘ. ব্যয়		
১.	বেতন ভাতা	১০,৯১,৬৮৬/-
২.	ডায়াগনস্টিক	৮,০২,৪৬০/-
৩.	অন্যান্য	৩,৫১,৯৮১/-
	মোট ব্যয়	২২,৪৬,১২৭/-
ঙ. স্থিতি (গ-ঘ) (৩১ ডিসেম্বর ২০২১)		৫,১৯,৪৪৯/-

অনুদান-

দানের পরিমান (টাকায়)	দাতার সংখ্যা
১০০০ থেকে ৪,৯৯৯	০৬ জন
৫,০০০ থেকে ৯,৯৯৯	০৮ জন
১০,০০০ থেকে ৪৯,৯৯৯	০৫ জন
৫০,০০০ থেকে ৯৯,৯৯৯	০৫ জন
১,০০,০০০ থেকে ১,৯৯,৯৯৯	০৫ জন
২,০০,০০০ থেকে ততোধিক	০২ জন
মোট ঃ ১৯,৩২,১৬০ টাকা	

বেশিরভাগ দাতাই নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বিধায় দাতাদের নামপ্রকাশ করা হলো না। আল্লাহ্ উনাদের দান গ্রহন করুন। এখলাসপুরের বহুলোক দান করেন, যাকাত দেন। তাদের মধ্য থেকে ইকোতে দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা গেলে ইকোর টাকার সমস্যা হওয়ার কথা না। এখানে উল্লেখ্য যে এবছর একজন শিল্পপতি আট লাখ টাকার বেশী দিয়েছেন।

রেহান উদ্দিন নেতা
সাধারন সম্পাদক
ইকো স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

তামাক নিয়ন্ত্রনে ইকোর সাফল্য

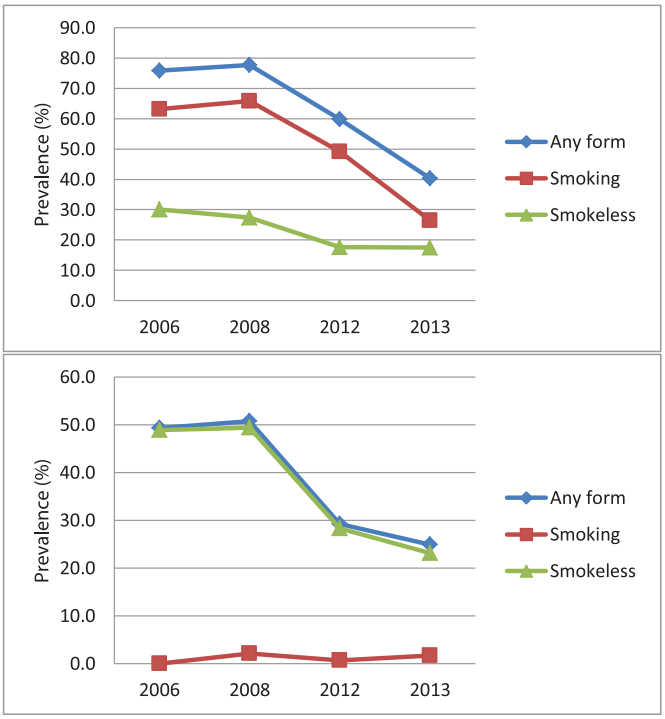


মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্যে একটি হলো স্বাস্থ্য সেবা, আর এই স্বাস্থ্য সেবাকে সামনে রেখেই "এখলাসপুর সেন্টার অফ হেল্‌থ" ইকো এর জন্ম ১৯৯৯ সালে। এই প্রতিষ্ঠান গ্রামীন পরিবেশে সর্বস্তরের জনগনের শারীরিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করে। ইকো চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার অর্ন্তগত এখলাসপুর গ্রামে অবস্থিত। সীমাবদ্ধতার প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে এই প্রতিষ্ঠান গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্টির দোর গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ডা. মোস্তফা জামানের এই মহতি উদ্দোগকে আরও বেগবান ও স্থায়ী করতে এরই মধ্যে তার পাশে এসে দাড়িয়েছে আরও কিছু মানব দরদী মানুষ। ফলে ইকোর কার্যক্রমে আরও গতির সঞ্চার হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে অসংক্রামন রোগের বিস্তার এখন শহরের গন্ডি ছেড়ে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। অসংক্রামিত রোগ সমূহ দ্রুত বিস্তার লাভ করায় বিশ্ব এখন এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎবিগ্ন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এখন একমত যে, রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করাই উত্তম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অসংক্রমিত রোগের প্রাদুর্ভাবের কারন হিসাবে কিছু ফ্যাক্টরকে সনাক্ত করেছে। সেগুলির মধ্যে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারকে অন্যতম কারন হিসাবে গন্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫৭০০০ জন লোক মারা যায় তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারনে। তামাকের ব্যবহার কমানো না গেলে এই সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাবে। ইকো অবশ্য তার জন্ম লগ্ন থেকেই তামাকের ব্যবহার কমানোর জন্য এখলাসপুর গ্রামে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রেখেছে। ২০০৪ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগীতায় ইকো আরও জোড়ালোভাবে তামাকের ব্যবহার কমানোর উদ্দ্যোগ গ্রহন করেছে। ইকো তার নিজস্ব স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্যে এলাকায় পূর্ব থেকেই অন্যান্য সমস্যার মত তামাকের উপরও ২ বৎসর পর পর সার্ভে করে ধুমপায়ী ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের সনাক্তের কাজটি করে আসতেছে।

তামাকের ব্যবহার কমানোর জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় ও নির্দেশনায় গনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে আলোচনা সভার মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকদের উৎসাহ দান করা হয়। আলোচনা সভায় তামাকের ক্ষতিকর দিকগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

চিত্র ১। এখলাসপুরে পুরুষ (উপরে) ও মহিলাদের (নিচে) তামাক ব্যবহারের হার, ২০০৬-২০১৪



তামাক নিয়ন্ত্রনের জন্য এলাকার জনসাধারনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাবে উদ্দ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তামাকমুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষনা করা হয়। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করা এবং এ উপলক্ষে গ্রামে গণর‍্যালী ও আলোচনার সভার আয়োজন করা হয়। অলোচনা সভায় তামাকের প্রতিকার দিক ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়াও ইকোর স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে কাউন্সিলিং করে থাকে। নিয়মিত ভাবে তিন মাস পরপর উঠান বৈঠক এর মাধ্যমে এর ফলোআপ করা হয়ে থাকে। উঠান বৈঠকগুলিতে ফ্লিপ চার্ট, ব্যানার, পোষ্টার , লিফলেট ব্রুশিয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে তামাকের সব ধরনের সাইন বোর্ড, পোষ্টার, ব্যানার, লিফলেট অপসারন করা হয়। জনসচেতনতার পাশাপাশি ইকো হাসপাতালে "সিজেশন ক্লিনিক" এবং কমিউনিটিতে "কমিউনিটি সিজেশন" প্রোগ্রাম চালু করা হয়। ধুমপান থেকে বিরত থাকার উপায় এবং কিভাবে বর্জন করা যায় এ ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়াই সিজেশন প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি এবং এলাকায় কয়েক বৎসরের ব্যবধানে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার অনেক কমে গিয়েছে। এ কারনের জন্য ইকোর পরিচিতি আজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে ভারতের মুম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ব তামাক বা স্বাস্থ্য সম্মেলন এর ১৪তম অধিবেশন। উক্ত সম্মেলনে ইকোর সিজেশন কার্যক্রমের একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য গৃহীত হয়। উক্ত উপস্থাপনাটি সারা বিশ্ব থেকে আগত প্রায় ৫৪০টি উপস্থাপনার মধ্যে একটি অন্যতম হিসাবে সম্মানিত হয়েছে। একটি আলাদা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাকে একটি মেডেল ও সম্মাননা দিয়ে উক্ত কাজের জন্য সম্মানিত করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশের গবেষকরা ব্যক্তিগতভাবে সিজেশনের কাজটির ভূয়সী প্রসংসা করে এবং প্রোগ্রামটি চালিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

২০১২ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ১৫তম তামাক বা স্বাস্থ্য সম্মেলনে কমিনিটি সিজেশনের উপর আবার আরও একটি প্রবন্ধ উপস্থানের জন্য গৃহীত হয়। তেমনি ২০১৮ সালে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ১৭তম বিশ্ব তামাক বা স্বাস্থ্য সম্মেলনে তামাক নিয়ন্ত্রনে ইকোর সাফল্যের আরও ১টি প্রবন্ধ উপস্থাপনার জন্য গৃহীত হয়। তাই ইকো এ কাজটি এখনও সচল রেখেছে, "মতলব উত্তর হবে তামাক মুক্ত" এ স্বপ্ন পূরনের আশায়।

ড. জসিমউদ্দিন আহমেদ
অনারারী পরিচালক, ইকো



মেডাল পরিহিত ড. জসিমউদ্দিন আহমেদ।



বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবসের র‍্যালি ২০১২

স্মৃতিকথন



সে দিন ছিল ৮ই মে। ইকোর জন্মদিন বা উদ্বোধনী দিন। আমার উপর দায়িত্ব ছিল ইকোর অকৃত্রিম বন্ধু নবও ইযাশাকিসহ আরো কয়েক জন অতিথিকে ঢাকা থেকে লঞ্চ করে এখলাসপুর নিয়ে যাওয়া। ডা. মোস্তফা জামান ভাই আগেই পূর্বপ্রস্তুতির জন্য এখলাসপুরে অবস্থান করছিলেন।

৮ই মে ১৯৯৯ সালের সকালটি শুরু হয়েছিল স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ নিয়ে, হালকা ঠান্ডা বাতাস, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। আমাদের লঞ্চটি গজারিয়া তিন নদীর মোহনায় আসার আগেই আকাশ কালো হতে শুরু করল। আস্তে আস্তে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। সাধারণত মে মাসে এই যায়গাটি এমনিতেই বিপদজনক থাকে, কয়েকজন বিদেশী অতিথিদের নিয়ে আমি একটু ভয় পেতে শুরু করলাম। গজারিয়া তিন নদীর মোহনায় আসার পর পরই প্রচন্ড বেগে বাতাস বইতে লাগরো ও বড় বড় ঢেউ , আমাদের লঞ্চটিকে কাগজের নৌকার মত ডান কাত, বাম কাত, সামনে পিছনে দুলাতে এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে নিয়ে চলছিল। বরিশাল মেডিকেলে পড়ার সুবাদে বড় লঞ্চে ঝড়ের কবলে পরেছিলাম কিন্তু ছোট লঞ্চে এবারেই প্রথম। জানি না কি ভেবে লঞ্চের লোকজন আমাদের কেবিনে থেকে বের হতে দেয়নি। যদি ঔদিন বড় ধরনের কোন দূর্ঘটনা হত, তাহলে ইতিহাসটি হয়ত অন্য রকম হত।

কিছু দিন আগে বাবা ইন্তেকাল করেছেন, আমার আট মাসের একজন ছেলে সাথে কয়েকজন বিদেশী অতিথি, তবে সব কিছুর নিয়ন্ত্রক মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। সকলের দোয়ায়, আল্লাহর রহমতে ঔদিন আমরা লঞ্চ ডুবি থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা পর এখলাছপুর এসে দেখি ইকোর জন্ম দিন বা উদ্বোধনী দিন উপলক্ষে প্যান্ডেল বাতাসের তোড়ে লন্ড ভন্ড হয়ে মাটিতে মিশে একাকার। তারপরও গ্রামবাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় ডা. মোস্তফা জামান ভাই এর দৃঢ়তায় আমরা ইকোর উদ্বোধনী কাজ সফলভাবে সম্পূর্ন করি।

ইকোর শুরুতেই স্বেচ্ছাসেবা মূলক প্রতি সপ্তাহে রুগি দেখা, গ্রামের চিকিৎসক, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, মসজিদের ইমামদেরও সাথে সভা করা, বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করে ইকোকে এখলাসপুরবাসীদের নিকট পরিচিত করার চেষ্টা করছিলাম। সকলের পরামর্শক্রমে সর্বস্তরের জনগনকে সম্পৃক্ত করার জন্য সদস্য হওয়ার জন্য আহবান করা ইত্যাদি কার্যক্রম নেয়া হচ্ছিল।

ইকো ১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করে সাধারণ রোগি দেখার সাথে চিকিৎসা ও নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম যেমন ধুমপান বিরোধী সভা, খাবারে অতিরিক্ত লবণ পরিহার এবং স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়। আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করে এবং নিজস্ব চিন্তা-ভাবনায় বেশ কয়েকটি মান-সম্মত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং কিছু কিছু এখনও চলমান। ফলে, ইকোর পরিচিতি, প্রসার, ব্যপ্তি নদী বিধৌত একটি গ্রাম থেকে বর্তমানে সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়েছে।

চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তরের নদী বিধৌত এখলাসপুর গ্রামটি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও বিভিন্ন পেশার শিক্ষিত-উচ্চ শিক্ষিত জনগনে সমৃদ্ধ একটি গ্রাম; এরই মাঝে এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ, ইকো স্বাস্থ্য সেবা মূলক একটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেকে ধন্য মনে করি এবং এর সফলতা কামনা করছি।

ডাঃ সরকার মোঃ নোমান
ডীন, স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।



ঢাকা, নারায়নগঞ্জ কিংবা চাঁদপুর থেকে এখলাসপুরে যাতায়াতের জন্য এখনো নদীপথই প্রধান মাধ্যম। এ পথে চলাচলকারী লঞ্চগুলো এখনো মান্দাতার আমলের রয়ে গেছে।

উচ্চরক্তচাপ: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত



উচ্চরক্তচাপ একটি নিরব ঘাতক ব্যাধিঃ

কি উন্নয়নশীল দেশ কি উন্নত বিশ্ব সব জায়গায় এটি সমভাবে বিরাজিত। কিন্ত উন্নত বিশ্বে এদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ও শিক্ষা ব্যবস্থার শক্তিমত্তার কারনে যত সহজে এ ঘাতক ব্যাধির উপর তাদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে পারে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো তত সহজে তা করতে পারে না। তাই আমাদের মত দেশে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় ভাবে বিভিন্ন সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অগ্রসর হলেই কেবল আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

ভূমিকাঃ

কার্ডিও ভাসকুলার রোগসমূহ পৃথিবী ব্যাপি মৃত্যুও কর্মক্ষমতা হারানোর মত বিষয়ে একটি বড় কারন হিসাবে স্বীকৃত। পৃথিবী ব্যাপি ৩০% মৃত্যু এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে ৮০% মৃত্যুর জন্য এই রোগসমূহকে দায়ী করা হয়। উচ্চরক্তচাপ কে CVD র জন্য সবচেয়ে বড় কারন বলে মনে করা হয়।

বিশ্বের এক চতুর্থাংশের ও বেশী বয়স্ক জনসংখ্যা এ রোগে আক্রান্ত বলে মনে করা হয়। ২০২৫ সালে এর হার ৩০% ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারনা করা হয়। এছাড়া উচ্চরক্তচাপ কিডনি বিকল হবার একটি বড় কারন হিসাবে ও চিহ্নিত করা হয়েছে। এটাও একটা উদ্বেগের কারন যে বিশ্বের চার ভাগের তিন ভাগ উচ্চরক্তচাপের রুগীর বসবাস আমাদের মত উন্নয়নশীল বিশ্বে এই প্রবন্ধে আমরা এই রোগের বিস্তার, রোগনির্নয়, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ বিষয়ে আলোকপাত করব।

রোগ নির্নয়ঃ

সঠিক ভাবে রোগ নির্নয় উচ্চরক্তচাপ নিরাময়ে প্রাথমিক ধাপ হিসাবে বিবেচিত। প্রত্যেক ডাক্তারের চেম্বারে যখনই কোন রুগী উপস্থিত হবেন তার দায়িত্ব হবে রুগীর রক্তচাপ নির্নয়। একবার রক্তচাপ নির্নয় করেই তাকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে যদি কিনা তা Hypertensive Emergenc না হয়।

নিম্নে Joint National Committee on Prevention, detection, Evaluation and Treatment of High blood Pressure JNC7 কর্তৃক অনুমোদিত উচ্চরক্তচাপের শ্রেণি বিভাগ উল্লেখ করা হল।

উচ্চ রক্তচাপের শ্রেনিবিন্যাস

শ্রেণিবিন্যাস	সিস্টলিক (mm of Hg)	ডায়াস্টলিক (mm of Hg)
Normal	<120	<80
Prehypertension	120-139	80-89
Stage 1 Hypertension	140-159	90-99
Stage 2 Hypertension	≥160	≥100

প্রতিটি রুগীর CBC, Urine R/E, Lipid Profile, S. Creatinine, Chest Radiograph এবং ECG করা উচিৎ।

জীবন যাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তনঃ

এ পদ্ধতি শুধু উচ্চরক্তচাপ রুগীই নয় যারা উচ্চরক্তচাপ মুক্ত তাদের জন্য ও উপকারী। যাদের রক্তে চর্বির পরিমান বেশী স্থুলকায় এবং যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের জন্য বেশী দরকারী ঃ

* এমন খাবার পছন্দ করতে হবে যাতে লবনের পরিমান কম থাকে খাবারের সময় আলাদা ভাবে লবন ব্যবহার করা যাবে না।
* Saturated fat, এবং কম চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত খাবার কম খেতে হবে।
* তাজা শাকসবজি বেশী খেতে হবে।
* ৩০-৬০ মিনিট শারিরীক পরিশ্রম, ব্যয়াম যেমন- দ্রুতহাটা, লাফালাফি করা, সাইকেল চালনা, অথবা সাতার।
* যাদের শারীরিক ওজন বেশী তাদের তাদের অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে।
* ধুমপান, জর্দা, নেশা জাতীয় দ্রব্য বর্জন করতে হবে।
* মদ্যপান বর্জনীয়।

চিকিৎসাঃ

উচ্চরক্তচাপ বিশিষ্ট রুগীর যদি রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকে ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। যদি তার রক্তচাপ সিস্টলিক >১৬০ মি. মি.মা. বা ডায়াস্টলিক >১০০ মি. মি.মা. থাকে। কিন্ত যদি রুগীর রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে তার সিস্টলিক >১৪০ মি. মি.মা. বা ডায়াস্টলিক ৯০ মি. মি.মা. তা হলে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। যদি রুগীর ডায়াবেটিস বা কিডনি ডিজিজ থাকে তার রক্তচাপ সিস্টলিক >১৩০ মি. মি.মা. বা ডায়াষ্টলিক >৮০ মি. মি.মা. থাকে তা হলেই চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

অধিকাংশ রুগীর ক্ষেত্রেই রক্তচাপ সিস্টলিক <১৪০ মি. মি.মা এবং ডায়াস্টলিক <৯০ মি. মি.মা. রাখা উচিৎ। কিন্ত ডায়াবেটিস ও কিডনি ডিজিজ এমন রুগীর বেলায় সিস্টলিক <১৩০ মি. মি.মা এবং ডায়াস্টলিক <৮০ মি. মি.মা. রাখাই শ্রেয়।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত ড্রাগ চয়েজ করা ভাল যাতে কার্ডিওভাস্কুলার সমস্যা গুলো কমিয়ে আনবে এবং স্বল্প মাত্রায় ডায়াজাইড ডাইইউরেটিকস ব্যবহার করা ভাল।

রুগীর বয়স ৬০ বছরের নীচে হলে বেটাবকার ব্যবহার করা যায় (যদি এজমা না থাকে) ৬০ বছরের উর্ধ্বে বয়সীদের ক্ষেত্রে বেটাব্লকার ব্যবহার করা উচিৎ নয় কারন তা কমই ভাল ফল বয়ে আনবে। এ ছাড়া Angiotensin Converting enzyme inhibitors, Long acting Calcium Channel blockers এবং Angiotensin receptors blockers প্রভৃতি ওষুধগুলো ব্যবহার করা যায়।

ডাঃ সাদেকুল ইসলাম
সিনিয়র কনসালটেন্ট



ইকোতে রোগীর রক্তচাপ মাপা হচ্ছে

উচ্চরক্তচাপজনিত রোগের জন্য ইকোর সিভিডি ক্লিনিকে যোগাযোগ করুন।

পাতে লবণ থেকে মুক্তি



বাংলাদেশে বর্তমানে উচ্চ রক্তচাপ খুবই সাধারণ রোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। দেশে প্রতি পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে একজন (২১%) আক্রান্ত। হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনী রোগ, পক্ষাঘাত, অন্ধত্ব সহ নানাবিধ জটিল অসুখের জন্য উচ্চ রক্তচাপ একটা মারাত্মক রিস্ক ফ্যাক্টর বা ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান।

উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক বলা হয়। কারণ, এই রোগের কোনো দৃশ্যমান লক্ষণ থাকে না। ফলে কারো উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও, তিনি যদি পরিমাপ না করেন তাহলে তার পক্ষে জানা সম্ভব নয় তিনি এই রোগে আক্রান্ত। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ভালো কৌশল হচ্ছে রক্তচাপ নির্ণয় করা। যদি দেখা যায়, তার রক্তচাপ বেশি, তখন জীবনাচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে ও নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করতে সবার উচিৎ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারা মেনে চলা।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অন্যতম একটি পদক্ষেপ হচ্ছে লবণ কম গ্রহণ। উচ্চ রক্তচাপ এবং লবণ গ্রহণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যা বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা বহুলভাবে স্বীকৃত। লবণের সোডিয়াম রক্তের জলীয় অংশ বাড়িয়ে দেয়, ফলে রক্তের চাপ বেড়ে যায়। খাদ্যে লবণের পরিমাণ হ্রাস করা হলে তা শুধুমাত্র উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ কমায় না, বরং হৃদরোগ থেকেও নিরাপদ রাখে।

উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির জন্য দৈনিক লবণ গ্রহণের মাত্রা ৫ গ্রাম (১ চা চামচ) নির্ধারণ করেছে। কিন্তু একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের জনগণ দৈনিক বিভিন্ন খাদ্যে নির্ধারিত মাত্রার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ লবণ গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত খাবারের স্বাদ বাড়াতে বেশি লবণ ব্যবহার করা হয়। অনেকেই ভাত-তরকারির সাথে আলগা লবণ খুব পছন্দ করেন। খাবারকে সুস্বাদু করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের উপাদান যেমন- কেচাপ, সয়া সস, টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করে থাকি। এসবে প্রচুর পরিমাণ লবণ থাকে। বর্তমানে ব্যস্ত জীবনযাত্রার জন্য অনেকে বাজার থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাবার কিনে আনেন, যাতে অধিক পরিমাণে লবণ ব্যবহার করা হয়। শুধু রান্না বা প্রক্রিয়াজাত খাবারেই নয়, বরং আমরা সিদ্ধ ডিম কিংবা বিভিন্ন কাঁচা ফলমূলও লবণ দিয়ে মাখিয়ে খাই, যা আসলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অন্যদিকে ফাস্টফুড, তেলে ভাজা খাবার, কাবাব সহ বিভিন্ন মজাদার খাদ্যে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি লবণ থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু চাইনিজ খাবারে ২ গ্রামেরও বেশি লবণ থাকে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্ধারিত ৫ গ্রামের চারগুণ। প্রকৃতপক্ষে লবণ খাওয়ার কুফল নিয়ে আমরা তেমন চিন্তাই করি না। শুধু জিহ্বার স্বাদের জন্য আমরা মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনছি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২৫ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে লবণ গ্রহণের মাত্রা ৩০ ভাগ কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। দৈনিক লবণ গ্রহণের পরিমাণ কমানোর ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের রান্নাঘর থেকেই। এজন্য দিনের শুরুতে রান্নার জন্য নির্ধারিত পরিমাণের লবণ আলাদা করে নিতে হবে। ধরা যাক, কোনো পরিবারে ৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আছেন। তাহলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান জনপ্রতি দৈনিক ৫ গ্রাম হিসেবে পরিবারটির জন্য একদিনে ২০ গ্রাম লবণ প্রয়োজন। সেই হিসেবে দিনের শুরুতে রান্নার জন্য ৪ চামচ বা ২০ গ্রাম লবণ আলাদা করে নিতে হবে। এরপর সেই লবণ দিয়েই সারাদিনের সব রান্না শেষ করতে হবে। খাবারের স্বাদ বাড়াতে লবণের পরিবর্তে টক দই, লেবুর রস ব্যবহার করা যেতে পারে। যারা অধিক লবণ খেয়ে অভ্যস্ত, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম কিছুদিন স্বাদ কম মনে হলেও, কয়েকদিনের মধ্যেই তারা অল্প লবণে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণের মাত্রা অনেক বেশি থাকে। সেজন্য যতটা সম্ভব প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া কমানো প্রয়োজন। প্রক্রিয়াজাত খাদ্য কেনার করার সময় ভোক্তারা খাদ্যে লবণের পরিমাণ দেখে কেনার অভ্যাস করাতা জরুরি।

প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণের মাত্রা নির্ধারণ করতে সরকার ও খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণের মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লবণ ব্যবহারের মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন। খাদ্য ক্রয় করার সময় ভোক্তারা যাতে খাদ্যে লবণের পরিমাণ দেখে কিনতে পারে সেজন্য মোড়কে লবণের পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ফ্রন্ট-অব-প্যাক লেবেলিং চালু করা অত্যন্ত জরুরি। সেই সাথে পণ্যের মোড়কে ট্রাফিক লাইটের আলোকে লাল, হলুদ ও সবুজ মার্কিং করা যেতে পারে, যাতে এই মার্কিং দেখে মানুষ বুঝতে পারে খাবারটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নাকি ক্ষতিকর। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিৎ, নিয়মিত প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের গুণমান এবং উপাদান প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা।

ড. সোহেল রেজা চৌধুরী
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইন্সটিটিউট

সাংবাদিকদের চোখে ইকো



গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় ইকোর অনবদ্য অবদান

দীর্ঘদিন ধরে মতলব উত্তর উপজেলার এখলাসপুর সেন্টার অফ হেল্‌থ বা ইকো গ্রামীন তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরিব-দুস্থ-অসহায় ও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় অনন্য অবদান রাখছে। মফস্বল শহরে ইকোর মতো একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ওই এলাকার মানুষের জন্য একটি আর্শীবাদ। স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত এই হাসপাতাল একটি সাফল্যের মাইলফলকও। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে উপজেলার প্রায় গ্রামের মানুষের চিকিৎসাসেবার নির্ভরতার নামই ইকো। শুধু মতলব উত্তর বা দক্ষিন উপজেলার লোকজনই নয় এই হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবায় উপকৃত হচ্ছে চাঁদপুরের সবকটি উপজেলার মানুষই। ইকোকে বলা হয় গরিব মানুষের হাসপাতাল। অর্থাৎ গরিব-দুস্থ মানুষ নামেমাত্র ফি বা টাকা দিয়ে হাসপাতালটিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সেবা পেয়ে আসছেন। স্বল্পমূল্যে প্যাথলজিকাল সুবিধাও পাচ্ছে এলাকার গরীব রোগীরা। বাতজ্বর, বাতজ্বজনিত হৃদরোগসহ আরও নানা জটিল ও কঠিনরোগের চিকিৎসায় ইকোর চিকিৎসকরা যেভাবে সেবা দিয়ে আসছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

দৈনিক প্রথম আলোসহ আরও বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইকোর অনবদ্য চিকিৎসাসেবার উপর ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক সংবাদ ছাপা হয়েছে। ইকোর জন্ম, প্রতিষ্ঠা ও এর আজকের এই সুদৃঢ় অবস্থানের পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি এখলাসপুরেরই কৃতি সন্তান ডা. মোস্তফা জামান। ডা. জসিমউদ্দিনসহ আরও বেশ ক'জন খ্যাতনামা চিকিৎসকের সহযোগিতায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত এই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানটি সাফল্যের স্মারক হয়ে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ডা. মোস্তফা জামান যেভাবে নিজের মূল্যবান সময় ও অর্থ ব্যয় করে তাঁর প্রিয় এলাকাবাসীর জন্য এই মানের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বানিয়েছেন তা তার দৃঢ় মনোভাব ও এলাকাবাসীর প্রতি মমত্ববোধেরই বহিঃপ্রকাশ। আমি ইকোর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও এই কর্মযজ্ঞের সাথে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মুহাম্মদ জাকির আহমেদ
প্রথম আলো



মতলবে গরীবের চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত এখলাসপুরের "ইকো" হাসপাতাল

৮মে ১৯৯৯ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় মতলবে গরীবের চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত এখলাসপুরের ইকো হাসপাতাল। হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন দেশ বরেন্য চিকিৎসক, মানবিক গুনাবলীসম্পন্ন মানুষ এখলাসপুর তথা বৃহৎ মতলবের কৃতি সন্তান ডা. মোস্তফা জামান। যিনি মূলত একজন স্বনামধন্য বাতজ্বর বিশেষজ্ঞ।

বৃহৎ মতলবে বেশ ক'জন বিখ্যাত চিকিৎসক থাকলেও উনিই দ্বিতীয়জন যিনি উপলব্ধি করেন মতলবের সাধারন মানুষ যাদের রাজধানী ঢাকা যেয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা নেয়া সম্ভব না তাদের জন্য কিছু করার। ছেংগারচরের কৃতি সন্তান এক সময়ের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ, চিকিৎসা শাস্ত্রের এক দিকপাল ডা. নোয়াব আলী। যিনি ১৯৬৩ সালে মতলবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেন মতলব কলেরা হাসপাতাল(আইসিডিডিআর'বি) । ৩৬ বছরের ব্যবধানে মতলব উত্তর উপজেলার এখলাসপুরে নিজ জমিতে প্রতিষ্ঠা করেন গরীবের চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত এখলাসপুর ইকো। এই উপজেলায় আরো অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত চিকিৎসক থাকলেও তারা নিজ নিজ অবস্থানে বিখ্যাত হলেও মতলবের সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য মতলবে এখনও কোনো চিকিৎসা কেন্দ্র বা হাসপাতাল তৈরি করতে পারেননি।

এখলাসপুর ইউনিয়নসহ পার্শ্ববর্তী জহিরাবাদ ও মোহনপুর ইউনিয়নের চরাঞ্চলের ৩০ শহস্রধিক মানুষের বসবাস চরে। যারা কিছুদিন আগ পর্যন্তও ঝাড়ফুকেই বিশ্বাসী ছিল। তাছাড়া, অদ্যবধি চরাঞ্চলের ৩০ হাজার মানুষের জন্য নেই কোন চিকিৎসা কেন্দ্র । ২০২২ সালের চরাঞ্চলের এই হাল হলে ১৯৯৯ সালে সেখানকার চিকিৎসার হাল কি ছিল তা খুব সহজেই অনুমেয়।

শুধু চরাঞ্চলই নয়, বৃহৎ মতলবের উত্তরাঞ্চলের মানুষের জন্য ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী হলেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সেবা পাওয়ার কোন সুযোগ ছিলনা। আর বাতজ্বরের চিকিৎসার বিষয়টি একদম ভিন্ন। গ্রামাঞ্চলে এর সেবা পাওয়ার চিন্তাও করা যায়না। আর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা তাতো কল্পনাতীত। এমন পরিস্থিতিতে এখলাসপুরের সন্তান ডা. মোস্তফা জামান আসেন মেঘনা পাড়ের মানুষের জন্য আশির্বাদ হয়ে।

প্রতিষ্ঠা করলেন বাতজ্বরসহ নানাবিধ চিকিৎসার এখলাসপুর ইকো হাসপাতাল। যে হাসপাতালটি মোটেই লাভজনক নয় বরং এই হাসপাতালটি ডা. মোস্তফা জামান বিভিন্নভাবে ভর্তুকি দিয়ে চালাচ্ছেন বিগত ২৩ বছর যাবৎ। অবিশ্বাস্য হলেও খোঁজখবর মতে এটাই চিরন্তন সত্য।

১৯৯৯ সাল থেকে এই ইকো হাসপাতালে নিয়মিত বসেন বাতজ্বরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার বসেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠতা, মানবিক গুনাবলী সম্পন্ন মানুষ ও গরীবের চিকিৎসক নামে খ্যাত ডা. মোস্তফা জামান। অতীতে আরো ৪ জন অধ্যাপক অন্যান্য শুক্রবারে সেবা দিয়েছেন। তারা হলেন ডা. জসিমউদ্দিন আহমেদ, ডা. সরকার মোঃ নোমান, ডা. সাদেকুল ইসলাম ও ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী। কিন্তু করোনাকালীন উনাদের সেবা ব্যহত হয়। উনারা আবারও ইকোতে সেবা চালিয়ে যাবেন এটাই রোগীদের প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে একজন প্রফেসরের ফি ১ হাজারের অধিক হলেও তিনি বর্তমানে নামমাত্র ৫০ টাকা ফি'তেই চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন। গত ২১ বছর চিকিৎসা নিচ্ছিলেন মাত্র ৩০ টাকা ফি'তেই। যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে একজন প্রফেসর এর ক্ষেত্রে কাল্পনিক হলেও এখলাছপুর ইকো হাসপাতালের ক্ষেত্রে এখানে এটাই বাস্তবতা। এখানে নামমাত্র ফি'তে চিকিৎসাপত্র দেয়ার পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে ২২টি পরীক্ষাও করা হয়। সরেজমিনে কয়েকদিন এই হাসপাতালে এসে রোগীদের সাথে কথাবলে এমনটাই প্রতীয়মান হয়েছে।

এই ইকো নামক চিকিৎসা কেন্দ্রে মেঘনাঞ্চলের চরের দরিদ্র লোকজন ছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ছেংগারচর পৌরসভা থেকেও রোগীরা আসে । এমনকি উপজেলার বাইরে থেকেও রোগী আছে এখানে।

এই হাসপাতালে প্রতিদিনই বসেন ডা. মোঃ নাহিদ সরকার। কোন রোগী আসলে চিকিৎসকের পরামর্শ না পেয়ে ফেরৎ যেতে হয়না। রোগীদের মধ্যে শতকরা ৮৫/৯০ ভাগ রোগীই গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের। যাদের পক্ষে ঢাকায় গিয়ে চিকিৎসা নেয়া সম্ভব না। খোজ খবরমতে, এই ইকো হাসপাতালে গত ২১ বছর যাবৎ এমবিবিএস ডাক্তারের ভিজিট ২০ টাকা আর একজন প্রফেসরের ভিজিট ৪০ টাকা যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তাও করা যায় না।

এখানে ২০+ ধরনের পরীক্ষা করা হয় যা নামমাত্র ফিতেই করা হয়ে থাকে। আল্ট্রাসনোগ্রামের ক্ষেত্রে এই এখলাসপুর ইউনিয়নের রোগীদের জন্য ফ্রী আর অন্যান্য এলাকার রোগীদের জন্য মাত্র ২শ টাকা হারে ফি নেয়া হয়ে থাকে যা বাজার মূল্যের(ফি'র) তুলনায় খুবই সামান্য।

সাক্ষাৎ পাওয়াটা সহজতর হওয়ায় প্রখ্যাত বাতজ্বর বিশেষজ্ঞ ডা. মোস্তফা জামান কে দেখানোর জন্য অনেক সময় ঢাকা থেকেও এখলাসপুরের ইকো হাসপাতালে রোগী নিয়ে আসেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালে এখলাসপুর ইকো হাসপাতালে উপস্থিত রোগীদের এলাকা ভিত্তিক এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এখলাসপুর ইউনিয়ন থেকে রোগী আসছে ৪ হাজার ৪৯৩ জন, জহিরাবাদ ইউনিয়ন থেকে ৯৪৮ জন, ফরাজিকান্দি ইউনিয়ন থেকে ৪৫১ জন, ফতেহপুর পশ্চিম থেকে ৩৮০ জন, মোহনপুর থেকে ৩১৪ জন, ছেংগারচর পৌরসভা থেকে ১০৯ জন, কলাকান্দা ইউনিয়ন থেকে ৯৯ জন এই হারে ইকো হাসপাতলে রোগী আসে। আর ২০২১ সালে মতলব উপজেলার বাইরে থেকে রোগী আসছে ১২২ জন। পুরো ২০২১ সালে এই ইকো হাসপাতালে সর্বমোট রোগীর সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ১০৬ জন। এছাড়াও ইকো বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেবা দিয়ে থাকে। উঠান বৈঠকের মারফতে জনসচেতনতা তৈরী, গর্ভবতীদের চেকআপ, জরিপের মাধ্যমে উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে রোগীদের সনাক্তকরনের কাজ চলমান রয়েছে।

এখলাসপুরের এই ইকো হাসপাতালে বর্তমানে একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান, ২ জন স্বাস্থ্য সহকারী, ১ জন পিয়ন এবং ১ জন ক্লিনার কর্মরত আছে। এ স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে ইকোর কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন। জনবল বৃদ্ধি করা দরকার।

মতলবে গরিবের চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত এখলাসপুরের এই হাসপাতালটি দীর্ঘ্য ২৩ বছর যাব মেঘনার চরাঞ্চলসহ উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছে। এই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের চিকিৎসার আশ্রয়স্থল ইকো হাসপাতালটি একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালনার প্রচেষ্টা চলছে। যার মাধ্যমে গরিবের চিকিৎসক ডা. মোস্তফা জামান বেঁচে থাকবেন সাধারন মানুষের হৃদয়ে।

শামসুজ্জামান ডলার
প্রতিনিধি, দৈনিক ইত্তেফাক



ইকো উদ্বোধনের পর মানুষের উৎসাহ উদ্দিপনা দেখা যায়

যদি মন ভালো করতে চান ইকো-তে আসুন



আমার শৈশব কেটেছে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ থানার লাউলহরী গামে। অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর আমার পরিবার পাড়ি জমায় কুমিল্লা শহরে। তারপর সেখানে এসএসসি, এইচএসসি পাশের পর গন্তব্য হয় যান্ত্রিক নগরী ঢাকায়, মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুবাদে। সেই থেকে আমি গভীরভাবে আমার গ্রামকে অনুধাবন করতে শুরু করি। কিন্তু, শহরমুখী হওয়ার পর থেকে গ্রামে যাওয়া হতো ঈদে বা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান থাকলে। তাই, মনের গহীনে এক সুবিশাল অনুভুতির জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমার শৈশব অতিবাহিত করা গ্রামের প্রতি। এ কারনেই সময় পেলেই ছুটে যেতাম প্রিয় শেকড়ের টানে।

এমবিবিএস পাশের পর আমি কিছুদিন রাংগামাটির এক প্রান্তিক হাসপাতালে চাকুরী করার সুবাদে আবার সেই গ্রামের চিরসবুজ প্রকৃতির স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ লাভ করি, সেটিও বেশী দিন স্থায়ী হয়নি উচ্চ শিক্ষার প্রশিক্ষণের কারণে। এ কারণে সবসময় মনে মনে চাইতাম আবার যদি কোনো গ্রামীণ পরিবেশে চাকুরির সুযোগ মেলে!



মহান আল্লাহ আবার মিলিয়ে দিলেন সেই আশার প্রতিফলন। তবে এবার একটু ভিন্নভাবে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই দেশ, কিন্তু এই শব্দগুচ্ছের প্রায় প্রতিটিই আজ হারানোর পথে। তারপরও মনে খুশি নিয়ে এক বুক আশায় পাড়ি জমালাম চাঁদপুরের মতলব উত্তরের মেঘনা নদী বিধৌত গ্রাম এখলাসপুরে, পরিচয় মেডিকেল অফিসার, এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো)।

এ শুরুটা ছিল অন্য সব কিছুর চেয়ে ভিন্ন কারণ এবার গ্রামের সাথে যুক্ত হয়েছে নদী ও লঞ্চ যাত্রার সৌন্দর্য উপভোগের এক মোক্ষম সুযোগ। ২৮ এপ্রিল ২০১৯ থেকে আমার ইকোতে পথচলা শুরু। তারপর সে বছরের ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত নিয়মিত ছিলাম। সেপ্টেম্বর থেকে উচ্চ শিক্ষার নিয়মিত প্রশিক্ষণ শুরু হলে প্রতি শনিবার ও ২য় শুক্রবার যাওয়া অব্যাহত রেখেছি। ২০২০ এর সেপ্টেম্বরে বর্তমান মেডিকেল অফিসার ডা. নাহিদ সরকার সাহেব (যিনি এখন নিয়মিত আছেন) জয়েন করার পর এবং তার কিছুদিন পর বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ শুরু হলে অনলাইনে রোগী দেখা শুরু করি যা এখনো চলমান রয়েছে।



শুরুর দিকে কিছুটা সময় লেগেছে এলাকার মানুষের সাথে নিজেকে গেঁথে ফেলতে, তবে সেটা খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সবার আন্তরিকতায়। ভোরে উঠে ফজরের পর হাঁটতে হাঁটতে বাজারে যেতাম এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের গা ঘেঁষা মেঠো পথ ধরে, যাওয়া আসার পথে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যে মন প্রাণ ভরে যেতো, পাটের মৌসুমে দেখেছি পাটের আঁশ ছারিয়ে সেগুলো রোদে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আঁশটে গন্ধটা তখনো বিদ্যমান।

আমি এই আঁশটে গন্ধে বিমোহিত হওয়ার লোভে একই রাস্তায় বারবার পায়চারী করেছি! তারপর ইকোতে ফিরে সকালের নাস্তা সেরে রোগী দেখা শুরু হওয়ার আগে যখন দোতলার বারান্দায় বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে জানালার ফাঁকে বাইরে তাকিয়েছি, তখন এতোটা ভালো অনুভূতি কাজ করতো তা বলে বোঝাতে পারবো না। তাই আমি আমার পরিচিত জনদের সাথে আলাপকালে প্রায়শই ইকো'র কথা বলে থাকি এভাবে করে- 'কারো মন ভালো করতে হলে ইকো তে বেড়াতে আসুন, আপনার মন ভালো হতে বাধ্য, যদি মন ভালো না হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত যে আপনার মনই নেই'।



রাতের ইকো

ইকো তে রোগী দেখার সুবাদে অল্প কিছুদিনের মধ্যে মানুষজন আমাকে বেশ আপন করে নিলেন, আমিও তা উপভোগ করতে লাগলাম। প্রায়সই কোনো না কোনো দাওয়াতের নিমন্ত্রণ পেতাম, এবং আমি সেগুলো না পারতে বাদ দিতাম না। আর আমাকে এতসব আনন্দের উপলক্ষ তৈরি করে দেয়ার জন্য আমি ইকো'র নিকট চির কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এখন অনেক বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান NGO (Non-Governmental Organization) আছে, কিন্তু আমি খুব গর্ব করে বলতে পারি ইকো তার কিছু অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্য সবার চেয়ে একদমই আলাদা যেমন ইকো শুধু একটি NGO নয়, আমার কাছে এটি একটি NNGPO (Non-Governmental Non-Profitable Organization) অর্থাৎ অলাভজনক বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান, যার প্রমাণ পাওয়া যায় এর অর্থনৈতিক রিপোর্ট এর স্বচ্ছতা থেকে, যে কেউ যে কোনো সময় দেখে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে ।



ইকোর সোনালু গাছ

আজকের এই অসাধারণ একটি প্রতিষ্ঠানের নেপথ্যে অনেক রথীমহারথী রয়েছেন কিন্তু তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডা. মোঃ মোস্তফা জামান এর ভাবনায় ইকো থাকে ২৪/৭ সময় ধরে। একজন মানুষ সন্তানের জন্য যেমন নিস্বার্থভাবে আজীবন করে যান, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবদি তাঁর কাছে ইকো সন্তান তুল্য এক গভীর আবেগ অনুভূতির নাম, যা সচরাচর খুঁজে পাওয়া দুস্কর।

পরিশেষে আমি ইকো এবং এর সাথে জড়িত সকলের সাফল্য ও সম্মৃদ্ধি কামনা করছি, এবং ইকো'র এই পথচলাকে মসৃণ রাখতে এখলাসপুরের সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহবান জানাচ্ছি।

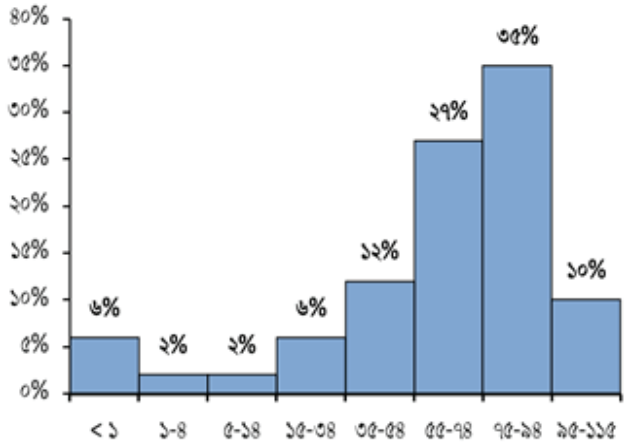
ডা. মু. আব্বাস ইবনে করিম
সিনিয়র মেডিকেল অফিসার, ইকো

আমরা মৃত্যু থেকেও শিক্ষা নেই



বয়স ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসঃ

ইকোর রেজিস্টার খাতা থেকে বিগত ২০ বছরে (২০০১-২০২১) সর্বমোট ৬৫০ জন মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। মৃত ব্যক্তিদের বয়স ভিত্তিক শ্রেবিন্যাস নিচের চিত্রে দেয়া হল। এতে দেখতে পাওয়া যায় ১ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যু ৬% আর ১ থেকে ৪ বয়সী শিশুর মৃত্যু ২%। অর্থাৎ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যু সর্বমোট ৮%। তবে অধিকাংশ মৃত্যুই ৫৫ থেকে ৯৪ বছরের মধ্যে। লক্ষণীয় যে শতকরা ১০ ভাগ মানুষ ৯৫ থেকে ১১৫ বছর পর্যন্ত আয়ু পেয়েছিল। (চিত্র ১)



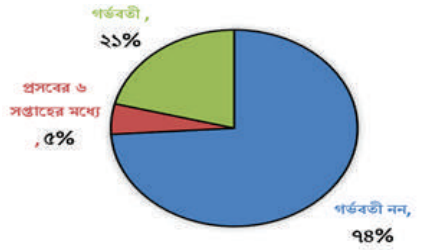
চিত্র ১: ২০০১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মৃতদের বয়সভিত্তিক শ্রেনিবিন্যাস

শিশু মৃত্যুর কারণ সমূহ:

ইকোর রেজিস্টার খাতায় বিগত ২০ বছরে পাঁচ বছরের কম বয়সী সর্বমোট ৫৬ জন শিশুর তথ্য পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে সর্বাধিক (২৯%) মৃত্যুর কারণ হিসেবে পাওয়া যায় "জন্মকালীন স্বল্পওজন"। দ্বিতীয় (১৬%) মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখা যায় "জন্মকালীন শ্বাস প্রশ্বাস জনিত সমস্যা" এবং তৃতীয় (১১%) মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখা যায় "শিশুর নিউমোনিয়া"। এছাড়াও আরো কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ হলো কলেরা, পানিতে ডুবে মরা ইত্যাদি।

মহিলাদের মৃত্যুর কারণ সমূহ:

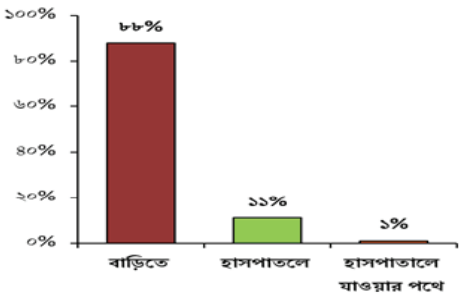
১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী সর্বমোট ৩৮ জন মহিলার মৃত্যুর কারণ উপরের ডান দিকের চিত্রে দেয়া হল। এক্ষত্রে দেখা যায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ (২১%) ছিলেন প্রসবের ৬ সপ্তাহের মধ্যে" আর ৫% মহিলা গর্ভবতী মারা যান।



চিত্র ২: ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী মোট ৩৮ জনের মৃত্যুর কারণ

স্থান ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস:

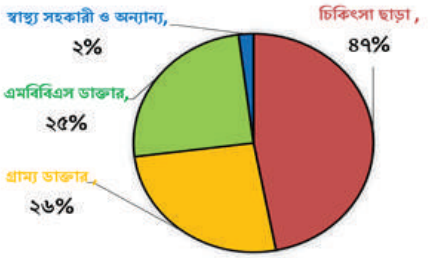
এসকল ব্যক্তিরা কোথায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন তার স্থান ভিত্তিক বিন্যাস নিচের চিত্রে দেয়া হল। এতে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ মানুষ (৮৮%) বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর ১১% মানুষ হাসপাতালে এবং মাত্র ১% মানুষ হাসপাতালে যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।



চিত্র ৩: মৃত ব্যক্তিদের স্থান ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস

বাড়িতে মৃত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ধরণ ঃ

ইকোর রেজিস্টার খাতায় বিগত ২০ বছরে পাঁচ বছরের কম বয়সী সর্বমোট ৫৬ জন শিশুর তথ্য পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে সর্বাধিক (২৯%) মৃত্যুর কারণ হিসেবে পাওয়া যায় "জন্মকালীন স্বল্পওজন"। দ্বিতীয় (১৬%) মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখা যায় "জন্মকালীন শ্বাস প্রশ্বাস জনিত সমস্যা" এবং তৃতীয় (১১%) মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখা যায় "শিশুর নিউমোনিয়া"। এছাড়াও আরো কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ হলো কলেরা, পানিতে ডুবে মরা ইত্যাদি। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী সর্বমোট ৩৮ জন মহিলার মৃত্যুর কারণ নিচের চিত্রে দেয়া হল। এক্ষত্রে দেখা যায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ (২১%) ছিলেন প্রসবের ৬ সপ্তাহের মধ্যে"। এদের মধ্যে ৫% মহিলা গর্ভবতী ছিলেন।



চিত্র ৪: বাড়িতে মৃত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ধরণ

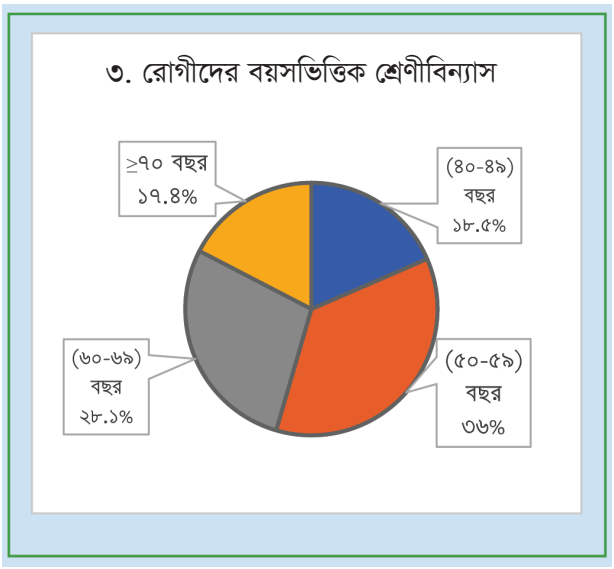
রিজওয়ান ভূঁইয়া
ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট

ইকো হৃদরোগ–স্ট্রোক রেজিস্ট্রি

ডাঃ মু. আব্বাস ইবনে করিম

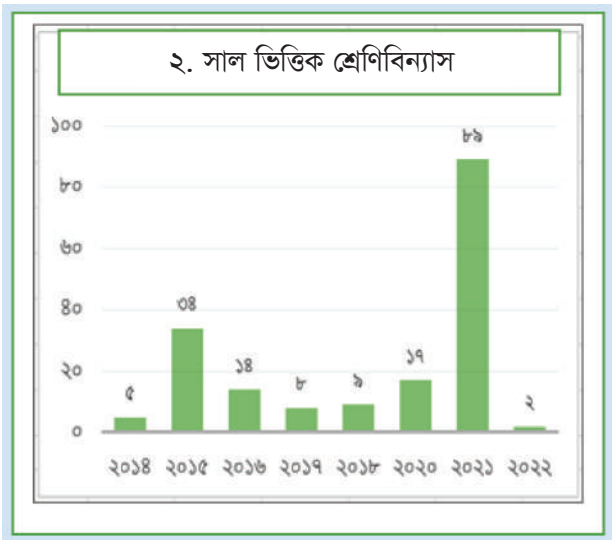


ইকো'র সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, যার মধ্যে সিভিডি বা কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ অর্থাৎ হৃদযন্ত্র ও রক্তনালীর বিভিন রোগ বিষয়ক সেবাটি অন্যতম। সূচনালগ্ন থেকেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক এ সেবাটি পেয়ে আসছেন এখলাসপুরের জনসাধারণ। ফলে, সচেতনতা বৃদ্ধির দরুন এ সমস্ত রোগের প্রকোপ যেমন কমেছে সেই সাথে কমেছে এগুলো থেকে হওয়া অকাল মৃত্যুর হার। আর এ সেবাটি এখলাসপুরের সর্বসাধারণ পেয়ে থাকেন বিনামূল্যে যা ইকো'র একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। আগেরদিন ফোন করা হয়, পরদিন সকালে এসে রোগীরা রক্ত ও প্রশ্রাব পরীক্ষা করান ও রিপোর্ট দেখিয়ে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি যান।



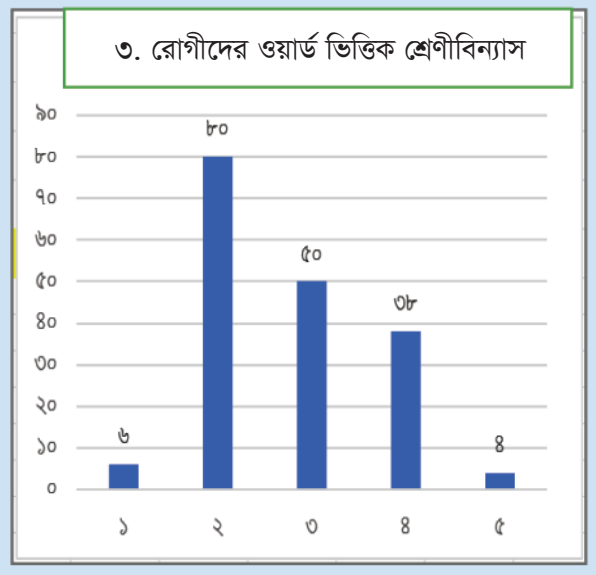
সাল, বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসঃ

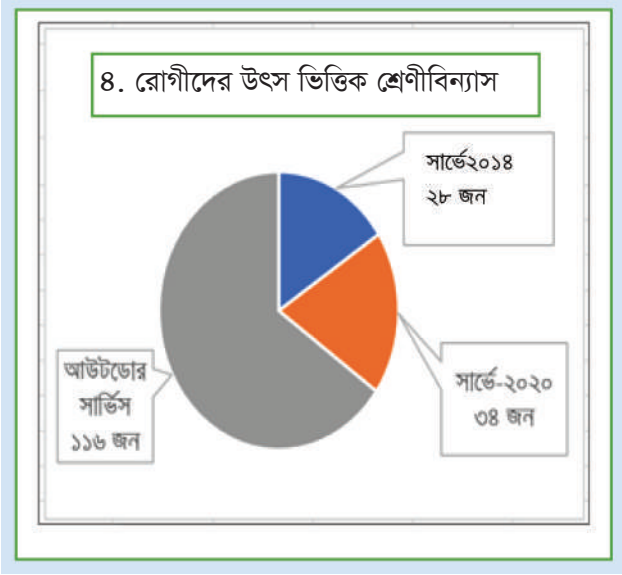
এ সেবাটি বেশ পুরোনো হলেও ২০১৪ সাল থেকে এটি নতুনরূপে হালনাগাদ করা হয়। ফলে এখন পর্যন্ত এ রেজিস্ট্রি এর অন্তর্ভুক্ত রোগীর মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৮ জন, যার মধ্যে দুই-ত্রিতীয়াংশই মহিলা (৬৭.৪ ভাগ, ১২০ জন)। রোগীদের রেজিস্ট্রেশনের সাল লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ২০১৪ সালে সর্বনিম্ন ৫ জন ও ২০২১ সালে সর্বোচ্চ ৮৯ জন রোগী নিবন্ধিত হয়েছেন (উল্লেখ্য, ২০২২ সালের রেজিস্ট্রেশন চলমান রয়েছে)। বয়স ভিত্তিক বিশ্লেষণ খেয়াল করলে প্রতীয়মান হয় যে, (৪০-৪৯) বছর বয়সী রোগীর সংখ্যা ৩৩ জন (১৮.৫%), ≥৭০ বছর বয়সী রোগীর ৩১ সংখ্যা জন (১৭.৪%) ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অর্থাৎ ১১৪ জন (৬৪.১%) রোগী (৫০-৬৯) বছরের সীমায় পড়েছে।



ওয়ার্ড ও উৎস ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসঃ

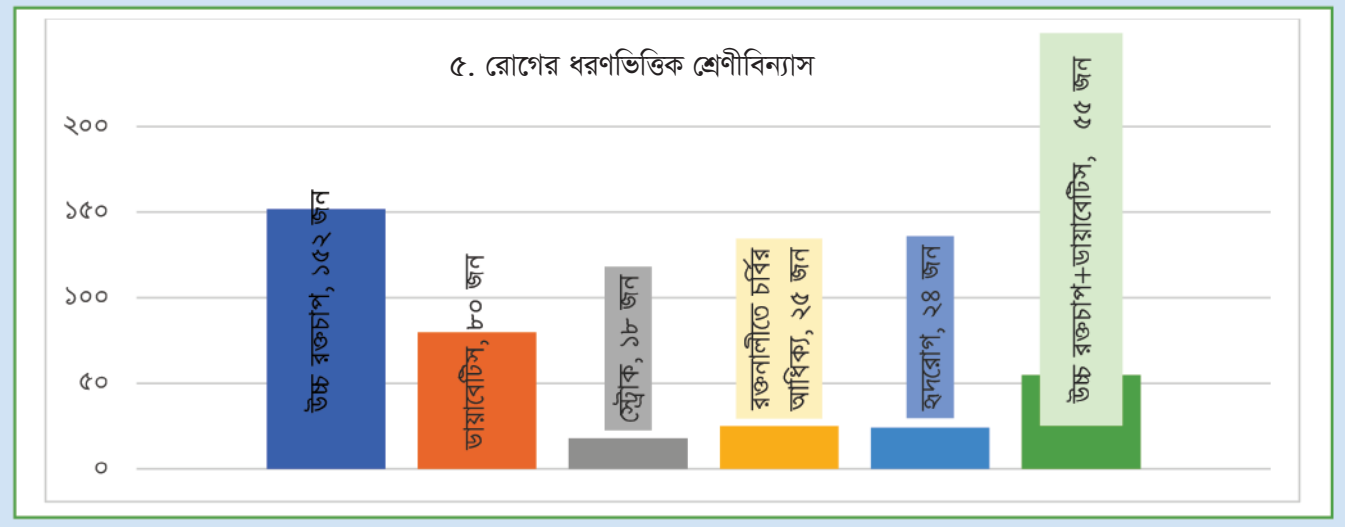
এখলাসপুর গ্রামটি কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। এ গ্রামের সকল তথ্য ডেমোগ্রাফিক সার্ভের মাধ্যমে ইকো সংরক্ষণ করে আসছে পর্যায়বৃত্তিকভাবে। রোগীদেরকে হালনাগাদ করার সময় ইউনিয়ন পরিষদ ও ইকোর ডেমোগ্রাফিক সার্ভের তথ্য অনুযায়ী ওয়ার্ডের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। এতে দেখা যায়, ১ নং ও ৫ নং ওয়ার্ডের রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬ জন ও ৪ জন; ২ নং ওয়ার্ড থেকে নিবন্ধিত হয়েছেন ৮০ জন (সর্বোচ্চ) এবং ৩ নং ও ৪ নং ওয়ার্ডের রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫০ জন ও ৩৮ জন। এ সমস্ত রোগী হালনাগাদ হয়েছেন বিভিন্ন উৎস থেকে যার মধ্যে ইকো'র হেলথ সার্ভের মাধ্যমে ৬২ জন ও আউটডোর সেবার মাধ্যমে ১১২ জন।





রোগের ধরণ ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসঃ

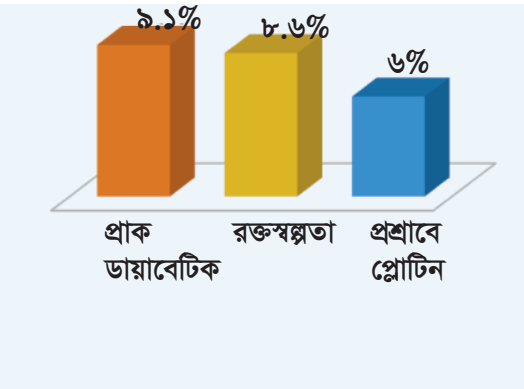
হৃদপিন্ড ও রক্তনালীর বিভিন্ন রোগের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, রক্তনালীতে অতিরিক্ত চর্বি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সিভিডি রেজিস্ট্রিতে অন্তর্ভুক্ত রোগীদের রোগের ধরণ বিশ্লেষন করলে দৃশ্যমান হয় যে, উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন ১৫২ জন, ডায়াবেটিসে ভুগছেন ৮০ জন, স্ট্রোক ও এর জটিলতায় ভুগছেন ১৮ জন, রক্তনালীতে অতিরিক্ত চর্বি জমাট বাঁধায় ভুগছেন ২৫ জন, হার্টের রক্তনালী সংকোচনজনিত রোগে ভুগছেন ২৪ জন এবং উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে সম্মিলিতভাবে ভুগছেন ৫৫ জন। এ সমস্ত রোগের রোগীদের প্রয়োজন নিয়মিত ফলো-আপ ও প্রয়োজনীয় নানা পরীক্ষা নীরিক্ষা। এরই নিমিত্তে ইকো'র স্বাস্থ্যকর্মীগণ প্রত্যেক রোগীকে এক মাস অন্তর অন্তর মোবাইল ফোনে কল করে বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাওয়াত দিয়ে আসেন ফলো-আপে আসার জন্য। তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা যায় সিংহভাগ রোগীই এটি মেনে চলেন, নিয়মিত ফলো-আপে আসেন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে তাঁরা শারীরিকভাবে অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন।



গর্ভবতীরা কেমন ছিলেন



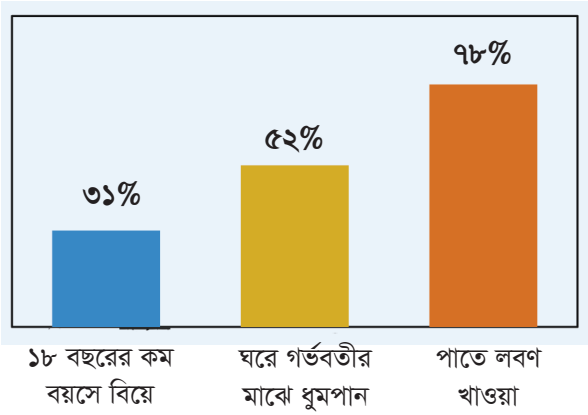
একজন সুস্থ মা-ই পারেন একটি সুস্থ সন্তান পৃথিবীকে উপহার দিতে। তাই জটিলতামুক্ত নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে গর্ভকালীন সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবস্থা মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। এতে করে পূর্ব থেকে বিদ্যমান কোনো রোগের এবং গর্ভাবস্থায় সম্ভাব্য জটিলতাসমূহের চিকিৎসার যথাযথ সুযোগ থাকে, যা মায়ের এবং ভ্রূণের স্বাস্থ্যের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ, প্রশ্রাবে প্রোটিনের উপস্থিতি, হাতে-পায়ে পানি জমা, রক্তস্বল্পতা, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস, মূত্রনালীর সংক্রমণ, রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ইত্যাদি।



ছবি-১: এখলাসপুর নিবাসি গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যবস্থা

এ সংক্রান্ত সেবাসমূহ গর্ভবতী মায়েরা 'এখলাসপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র' থেকে নিয়মিতভাবে পেয়ে আসছেন। ২০১৪ থেকে ২০২১ সালের বিভিন্ন সময়ে এযাবৎ সর্বমোট ১০৯ জন গর্ভবতী মা এখলাসপুর ও তার আশেপাশের এলাকা থেকে এখানে তাদের গর্ভকালীন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এসেছিলেন। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, তাদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে প্রায় ১ জনের প্রায়-ডায়াবেটিস (ডায়াবেটিস পূর্বাবস্থায় রক্তে শর্করার উচ্চ মাত্রা) এবং রক্তস্বল্পতা রয়েছে (ছবি-১)! যেখানে, তাদের মধ্যে প্রশ্রাবে প্রোটিনের উপস্থিতি, হাতে-পায়ে পানি জমা, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের হারগুলো ছিলো যথাক্রমে প্রায় ৬% (ছবি-১), ৩%, ২%, ও ১%। এবং, তাদের অধিকাংশের রক্তের গ্রুপ ছিলো 'বি' (৪০%), 'ও' (৩১%) ও 'এ'(১৮%)।

এছাড়াও, তাদের জনতত্ত্ব (ডেমোগ্রাফিক) ও উচ্চঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য আচরণগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে (৩১%), বাড়িতে কোনো পুরুষের ধূমপানরত অবস্থার সংস্পর্শে যাওয়া (৫২%), খাওয়ার সময় পাতে লবন ব্যবহার করা (৭৮%) ব্যপকহারে তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে (ছবি-২), যা তাদেরকে ও তাদের অনাগত সন্তানদেরকে আরো উচ্চমাত্রার স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও জটিলতার দিকে ধাবিত করতে পারে!



ছবি-২: জনতত্ত্ব ও উচ্চঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য আচরণগত তথ্য-উপাত্ত

বিবেচনায়, এ সম্পর্কিত একটি গবেষণাপত্র হংকং-এর 'জিয়াংয়া মেডিসিন' জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়, যা 'এখলাসপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে'র গবেষক দলকর্তৃক পরিচালিত হয়েছিলো। উপসংহারে, এখলাসপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামনিবাসি গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যবস্থার উন্নতিকরণ ও সম্ভাব্য জটিলতাসমূহ এড়াতে নিয়মিতভাবে গর্ভকালীন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদোপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিচর্যার কোনো বিকল্প নেই। সেই সাথে, খাওয়ার সময় পাতে লবন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং রান্নায় অল্প ব্যবহার করতে হবে। ধূমপায়ী ব্যক্তিদেরকে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, অন্ততপক্ষে ধূমপানরত অবস্থায় কোনো গর্ভবতী মায়ের সংস্পর্শে যাওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। এছাড়াও, গ্রামপ্রতিনিধি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে আরোও তৎপর হতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে আর কোনো মেয়ের ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে না হয়।

রাজিব মন্ডল
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
শিক্ষক ও গবেষক

এখলাসপুরের জনসংখ্যা

ডাঃ মো. নাহিদ সরকার



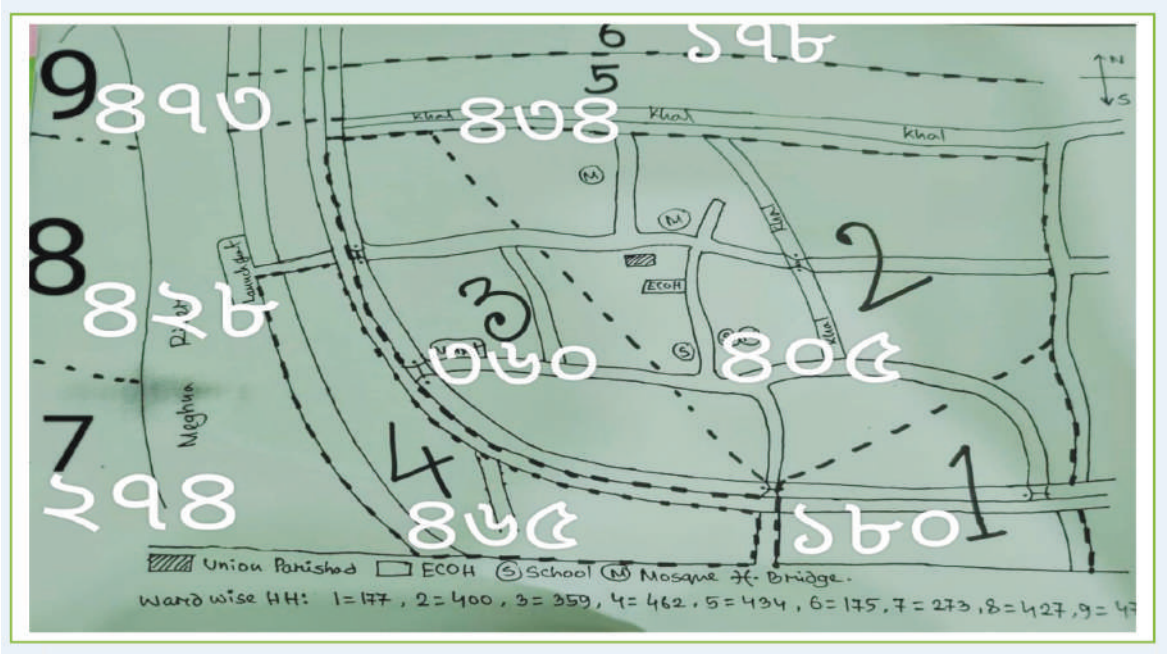
এখলাসপুর চাঁদপুর জেলার অর্ন্তগত মতলব উত্তর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী ইউনিয়ন। আয়তনে ৫০০১ একর বিশিষ্ট এই ইউনিয়নটি ৯ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। এই ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে মেঘনা নদী প্রবাাহিত হয়েছে। এর দক্ষিন-পূর্বে জহিরাবাদ ইউনিয়ন, উত্তরে মোহনপুর ইউনিয়ন এবং পশ্চিমে পদ্মা নদী অবস্থিত। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এখলাসপুর সমগ্র উপজেলার মধ্যে একটি ইর্ষনীয় অবস্থানে আছে। ইউনিয়নটির জনসংখ্যা বিষয়ক একটি উপাত্ত ডান দিকে প্রকাশ করা হলোঃ



মতলব উত্তর উপজেলা ম্যাপ

ওয়ার্ডভিত্তিক খানার সংখ্যাঃ

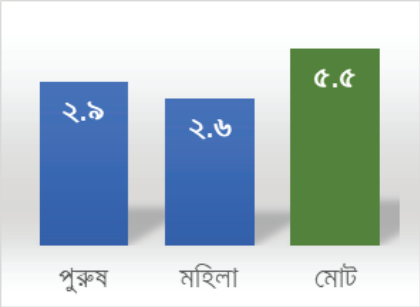
এখলাসপুরে মোট খানা রয়েছে ৩১৮০ টি। ওয়ার্ডভিত্তিক খানার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ৯ নং ওয়ার্ডে সর্বোর্চ ৪৭৩ ও ৬ নং ওয়ার্ডে সর্বনিম্ন ১৭৮ টি খানা রয়েছে।



এখলাসপুর ইউনিয়নের ওয়ার্ডভিত্তিক খানা সংখ্যার চিত্র

প্রতি খানায় গড় সদস্য সংখ্যাঃ

খানা ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রতি খানায় গড় সদস্যসংখ্যা ৫.৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২.৯ জন ও মহিলা ২.৬ জন। ডান দিকে চিত্র দেওয়া হলো।



চিত্র ৩: প্রতি খানায় গড় সদস্য সংখ্যা

ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যার শ্রেণিবিন্যাসঃ

এখলাসপুরের মোট জনসংখ্যা ১৭৮৮২ জন।
তন্মধ্যে পুরুষ ৯৩৮৭, মহিলা ৮৪৯৫। ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ৪ নং ওয়ার্ডে সর্বাধিক ২৬০৫ জন ও ১ নং ওয়ার্ডে সর্বনিম্ন ১০২১ মানুষ বসবাস করে। বাঁকি ওয়ার্ড গুলোর তুলনামূলক তালিকা নিচে দেখানো হলোঃ

ওয়ার্ড নং	খানার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	১৮০	৪৫১	৪৭৮	১০২১
২	৪০৫	১২৮৭	১১৯০	২৪৭২
৩	৩৬০	১০৮২	৯২৪	২০০৬
৪	৪৬৫	১৩৫৫	১২৪৮	২৬০৫
৫	৪৩৫	১২৩০	১১২৭	২৩৬০
৬	১৭৮	৫৩১	৫৩০	১০৬৩
৭	২৭৪	৭৯৪	৬৮৭	১৪৬৬
৮	৪২৮	১১৭৮	১১২৪	২৩০০
৯	৪৭৩	১৩৮০	১২০০	২৫৭৮
সর্বমোট	**৩১৮০**	**৯৩৮৭**	**৮৪৯৫**	**১৭৮৮২**

বর্হিবিভাগের আমাদের অতিথিরা

ডাঃ মো. নাহিদ সরকার



২০২০ সালের আগস্ট মাসে ইকো ইন্টারনেট ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার শুরু করে। তার পর থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে ৬৩১৫ বার রোগী দেখা হয়েছে। সেই রোগীদের তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো

চিকিৎসা নিতে রোগীদের উপস্থিতি বিশ্লেষণঃ

ইকোতে আগত রোগীদের উপস্থিতি বিশ্লেষন করলে দেখতে পাওয়া যায় যে ইকোতে এসে ২০ বারের বেশী সেবা নিয়েছেন এমন রোগী ১১ জন। ১০ বারের বেশী সেবা গ্রহন করেছেন ১৭৫ জন। ১ বারই সেবা নিয়েছেন ২৫৯২ জন। ২ বা ততোধিক বার এসেছেন ৩৫৪৮ জন।

ভিজিট নং	পরিমান
১ বার	২৫৯২ জন
২ থেকে ৯ বার	৩৫৪৮ জন
১০ থেকে ১৯ বার	১৭৫ জন

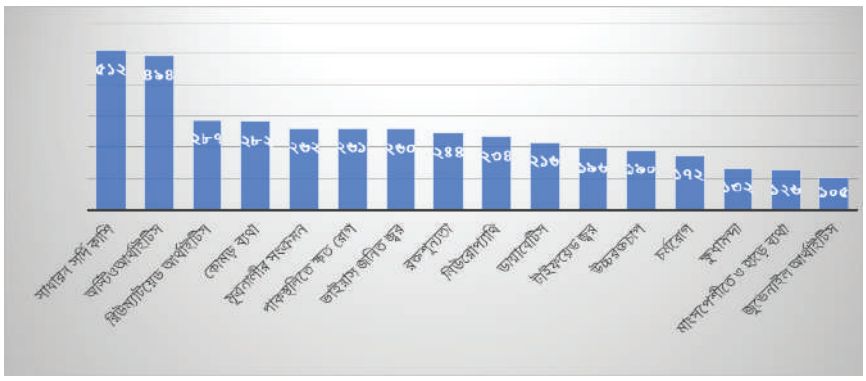
চিকিৎসা নিতে রোগীদের উপস্থিতি বিশ্লেষণঃ

ইকোতে আগত রোগীদের উপস্থিতি বিশ্লেষন করলে দেখতে পাওয়া যায় যে ইকোতে এসে ২০ বারের বেশী সেবা নিয়েছেন এমন রোগী ১১ জন। ১০ বারের বেশী সেবা গ্রহন করেছেন ১৭৫ জন। ১ বারই সেবা নিয়েছেন ২৫৯২ জন। ২ বা ততোধিক বার এসেছেন ৩৫৪৮ জন।

বয়স	সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
০-৪	১৩৬৫	৭৭১	৫৯৪
৫-১৭	১৩৪৯	৬০৮	৭৪১
১৮-৩৯	২৭৯২	৮৪৬	১৯৪৬
৪০-৫৯	২৬৫৫	৯০৬	১৭৪৯
৬০ বা ততোধিক	২০৬৬	৮৮০	১১৮৬

রোগের বর্ণনা

ইকো হাসপাতালে বাতজ্বর চিকিৎসার জনপ্রিয়তা আছে। সেকারনে এখানে অনেক বাতের রোগী সেবা নিতে আসেন। সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে নিম্নলিখিত রোগগুলি উল্লেখযোগ্য



হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করুন



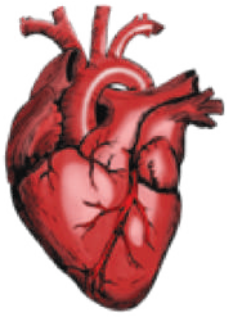
হার্ট শরীরে রক্ত চলাচলের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে পাম্প করে শরীরের সকল অঙ্গে রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করে। সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি। এটি মায়ের গর্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরামহীন কাজ করে। তাই হার্ট থেমে গেলে জীবনও থেমে যাবে।

হার্ট অ্যাটাক

অন্য অঙ্গের প্রয়োজন মেটাতে রক্ত সরবরাহ করে হার্ট। তেমনি নিজের পেশিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার নিজেরও রক্তের দরকার। হার্টে রক্ত চলাচলের জন্য অনেকগুলো ছোট ছোট রক্তনালী থাকে। এদের অভ্যন্তরীণ ফাঁকা নালী অত্যন্ত সরু। তাই নালী সহজেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। নালীগুলোতে চর্বি জমতে থাকলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে এক সময় রক্তনালী একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং ওই নালী হার্টের যে অংশে রক্ত সরবরাহ করে সে অংশে পেশী স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একেই হার্ট অ্যাটাক বলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে 'মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান' বলা হয়, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'হৃদপিন্ডের পেশির মৃত্যুবরণ'। হার্ট অ্যাটাকের রোগীদের অনেকেই চিকিৎসার সুযোগ পান না, হাসপাতালে পৌঁছার আগেই মারা যান।

প্রতিরোধ

বয়োবৃদ্ধদের হার্ট অ্যাটাক সারা দুনিয়াতেই হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের ফলে হার্ট অ্যাটাক কমে এসেছে অনেক উন্নত দেশে। কিন্তু আমাদের দেশে হার্ট অ্যাটাক বাড়ছে। এমনকি অনেক অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাকে প্রাণ হারাচ্ছেন। অথচ একটু সচেতন হলে এবং জীবনশৈলী বদলালে হার্ট অ্যাটাকের ঝুকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব।



চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত অনেকগুলো কারণকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু যে সব বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে-ধুমপান, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, অতিরিক্ত ওজন, রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল এবং অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার।

১. ধুমপান

ধুমপান হার্ট অ্যাটাকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধুমপান রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমায় এবং রক্তনালীকে দূর্বল করে। রক্তনালীর ভেতরে অবস্থিত ঝিল্লিতে ক্ষত তৈরী করতে পারে। ক্ষতস্থানে সহজে চর্বি জমে যেতে পারে। তাই আপনি ধুমপায়ী হলে ধুমপান বন্ধ করুন। আর অধুমপায়ী হলে ধুমপান করবেন না।

২ উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তনালীর ক্ষতি করে এবং রক্তনালীতে চর্বি জমতে সাহায্য করে। দীর্ঘদিন ধরে রক্তচাপ বেশী থাকলে হার্ট পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে এবং হার্ট অ্যাটাক ত্বরান্বিত করবে। আপনার রক্তচাপ নিয়মিত পরীক্ষা করাবেন। শরীরকে সচল রাখবেন, ওজন নিয়ন্ত্রনে রাখবেন, রান্নায় লবন কম ব্যবহার করুন, পাতে লবন একেবারেই খাবেন না। চর্বি জাতীয় খাবারের পরিবর্তে তাজা ফল ও শাকসবজি খেলে রক্তচাপ কমবে। অ্যালকোহল পান করার অভ্যাস থাকলে এর পরিমাণ সীমিত রাখুন। অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করলে রক্তচাপ বাড়বে এবং হার্টের পেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতিরিক্ত ক্যালরির ফলে ওজন বেড়ে যাবে। ডাক্তরের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত রক্তচাপ কমানো ঔষধ সেবন করুন।

৩. বহুমূত্র

বহুমূত্র রোগ রক্তনালীতে চর্বি জমা ত্বরান্বিত করে। হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কয়েকগুন বাড়িয়ে দেয়। বহুমূত্র রোগের বেশির ভাগ জীবনশৈলী পরিবর্তন করেই নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। 'শৃঙ্খলাই জীবন' বহুমূত্রের মূলমন্ত্র। খাদ্য নিয়ন্ত্রন, পরিমিত কায়িক পরিশ্রম ও প্রয়োজনে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক ঔষধ গ্রহন করলে বহুমূত্র নিয়ন্ত্রন হবে এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুকি কমে যাবে।

৪. শারীরিক পরিশ্রম ও ওজন

নিয়মিত মাঝারি পরিমান শারীরিক পরিশ্রম হার্টের জন্য ভালো। পরিশ্রম কম করলে গৃহীত ক্যালরী খরচ হবে না এবং শরীরে চর্বি আকারে জমতে থাকবে। ফলে ওজন বাড়বে। রক্তনালীতেও এই চর্বি জমবে। অধিকন্তু কায়িক পরিশ্রম কম হলে আপনা রক্তচাপও বেড়ে যাবে। সব মিলিয়ে নিষ্ক্রিয়তা ও অতিরিক্ত ওজন রক্তচাপ বাড়াতে ও রক্তনালীতে চর্বি জমতে সাহায্য করবে। প্রতিদিন অন্তত ২০ মিনিট দ্রুতগতিতে হাঁটুন। অল্প দূরত্বের গন্তব্য পায়ে হেঁটে চলুন এবং রিক্সা ও গাড়ি পরিহার করুন। লিফট ব্যবহার না করে সিড়ি ব্যবহার করুন। পেট মোটা হয়ে যাচ্ছে কিনা সতর্ক নজর রাখুন। দক্ষিন এশিয় লোকদের মধ্যে এটি হার্ট অ্যাটাকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৫. খাদ্য ও কোলেস্টেরল

উপরে বর্নিত কারনগুলো একবারে কেন্দ্রে রয়েছে রক্তের কোলেস্টেরল। এটি প্রধানত খাদ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (কিছু বংশানুক্রমিক ক্ষেত্র ব্যতিত) । কোলেস্টরল এক প্রকার চর্বি জাতীয় প্রদার্থ। এটি আমরা খাবার হিসাবে খাই। শরীরের ভেতরেও কোলেস্টরল তৈরী হয়। রক্তে কোলেস্টরল বাড়লে রক্তনালীতে চর্বি জমা ত্বরান্তিত হয়। কোলেস্টরলের জন্য খাবার হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয়। চর্বির প্রকারভেদে খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: সম্পৃক্ত চর্বিসমৃদ্ধ, অসম্পৃক্ত চর্বিসমৃদ্ধ এবং কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার।

সম্পৃক্ত চর্বিসমৃদ্ধ খাদ্য: ঘি, বাটার, পাম ওয়েল, দুধ, ক্রিম, আইসক্রিম, চিজ, লিভার, কিডনি, মগজ, এবং গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও শুকুরের মাংস।

অসম্পৃক্ত চর্বিসমৃদ্ধ খাবার: কিছু সামদ্রিক মাছ এবং জলপাই, ক্যানোলা, সানফ্লাওয়ার, কর্ণ ও সয়াবিন তৈল।

কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাদ্য: কোলেস্টেরল কেবলমাত্র প্রানীজ খাদ্য, যেমন- গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শূকর, হাঁস-মুরগির মাংস, এবং চিংড়ি মাছ, ডিমের কুসুম, কিডনি, লিভার ও মগজে থাকে। সম্পৃক্ত চবি বেশী পরিমান খেলে কোলেস্টেরল বাড়ে। পক্ষান্তরে সম্পৃক্ত চর্বির পরিবর্তে অসম্পৃক্ত চর্বি খেলে কোলেস্টেরল কমে। কোলেস্টেরল বেশী আছে এমন খাবার খেলেও রক্তের কোলেস্টেরল বাড়ে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য সম্পৃক্ত চর্বি ও কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবারগুলো কম খাবেন।

সম্পৃক্ত চর্বিসমৃদ্ধ খাদ্যের প্রতি বেশী সতর্ক হবেন। তবে খাবারগুলো একেবারে বন্ধ দেওয়া প্রয়োজন নেই। কারন আপনার শরীরের জন্য এগুলোও দরকার আছে। রান্নার আগে মাংশের গায়ে লেগে থাকা চর্বি এবং হাঁস-মুরগির চামরা চামরা ফেলে দিন। রান্নার সময় কম পরিমান তেল ব্যবহার করুন। ঘি, বাটার ও পাম ওয়েল ব্যবহার না করাই ভালো। জলপাই, ক্যানোলা, সানফ্লাওয়ার, কর্ণ ও সয়াবিন তেল ব্যবহার করুন।

এসব রান্নার তেলে কোলেস্টেরল নেই, এদের থেকে বেশি ক্যালরি পাওয়া যায় বলে বেশি পরিমান খেলে ওজন বেড়ে যাবে। তাজা ফল ও শাকসজিতে কোলেস্টেরল থাকে না, সম্পুক্ত চর্বির পরিমান খুবই নগন্য, ক্যালরিও কম থাকে। এসব খাদ্যে বেশি 'স্টার্চ', আঁশ ও চর্বি জমাট বিরোধী ভিটামিন'সি', ভিটামিন 'ই', এবং 'বিটাকেরোটিন' পাওয়া যায়।

চর্বিসমৃদ্ধ খাবারের পরিবর্তে এগুলো খেলে কোলেস্টেরল এবং হার্ট অ্যাটাক কমবে। 'মিষ্টি' আমাদের দেশে অতি প্রিয় খাদ্য। মিষ্টিতে সম্পৃক্ত চর্বি, কোলেস্টেরল এবং ক্যালরী বেশি থাকে। তাই এগুলো কম খাওয়াই ভালো। আপনার কোলেস্টেরলের পরিমাণ জেনে নিন।



হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধের জন্য এক নম্বর লক্ষবস্ত হচ্ছে রক্তের চর্বি বা 'লিপিড'। তাই গত বছর জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ কেন্দ্রে (সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল কমপেক্স, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭।) একটি 'লিপিড ক্লিনিক' চালু করা হয়েছে। যাদের এখনো হার্ট অ্যাটাক হয়নি তারা এই ক্লিনিকে হৃদরোগ প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞ এবং পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিতে পারেন।

স্বাস্থ্য নকশা
প্রথমআলো, মঙ্গলবার, ২৯ অক্টোবর ২০০২

ডা. মোঃ মোস্তফা জামান
সহকারী অধ্যাপক
জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।



বন্ধু ডাঃ মোস্তফা তৌফিকের সাথে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের বাতজ্বর ডিপার্টমেন্টে গিয়ে ডা. মোঃ মোস্তফা জামান ভাইয়ের সাথে প্রথম দেখা। কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে একদিন উনার সাথে রওয়ানা হলাম মেঘনার কোল ঘেঁষা মতলব উত্তরের 'এখলাসপুরের' দিকে। প্রায় তিন ঘণ্টা ভ্রমণের পর পৌঁছলাম ইকো'তে। ইকো'র সাথে চলার সেই শুরু।

দশ বছর ইউরোপে থাকা এবং এক বছর বাংলাদেশে সরকারি মেডিকেল কলেজে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সেবা দিতে এসে প্রথমেই আমার এখলাসপুরের মানুষদের ভালো লেগে গেল। ছোট্ট একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। মাত্র তিনটি কক্ষ এবং একটি টয়লেট। দুইজন কর্মচারী। অফিস কাম ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অফিস সহকারী। একতলা সেই ইকো স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে তখন ঢাকার সাথে যোগাযোগের খুব সমস্যা ছিল। মোবাইল নেটওয়ার্ক তখন এতো বিস্তৃত হয়নি। বিশাল লম্বা বাঁশের মাথায় এন্টেনা লাগিয়ে মোবাইল নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে হত। মোবাইল পকেটে নিয়ে এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করার তখন সুযোগ ছিলনা, তাই পকেটের বদলে মোবাইল তখন শোয়ার ঘরের টেবিলই পড়ে থাকতো। প্রথম প্রথম এখলাসপুরবাসী আমাকে তাদের একজন হিসেবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠা ও আড়ষ্টতা দেখাতো। আমার আর এখলাসপুরবাসীর সম্পর্কের মাঝে বাঁধা হিসেবে কাজ করা অদৃশ্য দেয়ালটি ভাঙ্গার কৌশলী উদ্যোগ আমাকেই নিতে হলো। প্রথমে এলাকার তরুণদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তাদের কাছাকাছি চলে এলাম। এরপর বয়স্ক মরুব্বীদের নানা আত্মীয়বাচক সম্বোধনে ডাকা শুরু করলাম। তারাও পাল্টা আমাকে একই সম্বোধনে ডাকতে লাগলো। উইন উইন সিচুয়েশনে আমি তাদের একজন হয়ে গেলাম। ইকোতে তখন কোন টিভি, কম্পিউটার ছিলনা। সন্ধ্যার পরে সময়গুলো তাই যথেষ্ট বোরিং লাগতো। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আমার সহায় হলো ঢাকা থেকে নিয়ে আসা বইগুলো। বই পড়েই সময়টা কাটিয়ে দিতাম। এলাকার তরুণদের সাথে সখ্যতার কথা আগেই বলেছি। তাদের একজন গিটার বাজিয়ে ভালো গান করতো। ফলে তাদের সাথে গল্প, গানে সময়টা বেশ কাটছিল। এভাবেই ইকো'র সাথে একাত্ম হওয়ার শুরু।

আমার আন্তরিকতা ও ভালো ব্যবহারে ইকো'তে ধীরে ধীরে রোগীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। তা সত্ত্বেও আমি আত্মতৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। রোগীদের ঔষধের সাথে প্রেসক্রিপশন মিলিয়ে দেখলে প্রায়ই দেখতাম ফার্মেসির লোকেরা প্রেসক্রিপশনের ঔষধ পাল্টে নিম্নমানের কোম্পানির ঔষধ রোগীকে গছিয়ে দিতো।

একদিন এখলাসপুর বাজারের ঔষধের দোকান পরিদর্শনে বের হলাম। দেখলাম দোকানের তাকের বেশীরভাগই ঠাসা নিম্নমানের ঔষধ দিয়ে। এদের কয়েকজনের সাথে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, আমার প্রেসক্রিপশনের ঔষধ গুলো দয়া করে পাল্টে দেবেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁরা কেউ আমার অনুরোধ রাখেননি। এই বিষয়ে ডা. জামান ভাইয়ের সাথে কথা বললাম। তাঁর উদ্যোগে ইকো'র পরিত্যক্ত গ্যারেজে এলাকার জার্মান ফেরত একজন ভদ্রলোকের মাধ্যমে একটি ঔষধের দোকান খুললাম। বেশকিছু ভালো কোম্পানির গজ দ্বারা Credit এ ঔষধের ব্যবস্থা করলাম। এরপর Prescribed ঔষধ নিয়ে আর কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। মানসম্পন্ন ঔষধের সাথে ইকোর মেলবন্ধনের সেই শুরু।

আমার আরেকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. আশির আহমেদ (জাপান প্রবাসী এবং ডা. জামান ভাইয়ের কাজিন) এর বাড়িও এখলাসপুরে। বাড়িতে যেয়ে আশিরের দাদুকে চিকিৎসা দেয়ার সময় উনি বলতেন, 'তুমি আমার নাতি বাবুর বন্ধু?' কথাগুলো বলার সময় উনাকে খুবই খুশী খুশী লাগতো! অনেক বয়স্ক মুরুব্বীদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছি তাঁদের বাসায় গিয়ে। এতে আমার আর ইকো উভয়েরই জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো দিন দিন। মনে পড়ে, দুপুরে বা রাতে খাবারের সময় এ বাড়ি, সে বাড়ি থেকে আমার জন্য কলাটা, মুলোটা, দুধ, ডাল এটা সেটা পাঠানো হতো। এখলাসপুরবাসীর ভালোবাসায় সিক্ত হচ্ছিলাম অবিরাম। ইকো'র কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতনভাতা ঢাকা থেকে ফান্ডিং করা হতো। আমি চাইলাম এই বেতন ভাতার ফান্ড যেন ইকোর আয় থেকেই তৈরি হয়। একটা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে পরবর্তীতে সেটা করতে পেরেছিলাম। ইকো'র স্বাবলম্বী হওয়ার সেই শুরু।

আমার এই সুখের এখলাসপুর জীবনে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে ষাটনলে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ ডুবে ছয় শতাধিক মানুষের করুন সলিল সমাধির কারণে। আমেরিকা প্রবাসী আমার মা ও ভাই বোনেরা জানতে পারে, এই নদী পেরিয়েই আমাকে এখলাসপুরে যাতায়াত করতে হয়। তাই তাঁরা চায় না আমি এখলাসপুরে থাকি। মায়ের আদেশ অমান্য করতে পারিনি। চলে আসতে হয় এখলাসপুর থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ঢাকায় বেশ কিছুদিন ধরে ইকো'র ফেসবুক একাউন্টে দেখছি এবং শুনছি, ইকো এখন বেশ শক্ত ভিতে দাঁড়ানো একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।



তৎকালীন ইকোর দালান

মেডিকেল অফিসারদের জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এটাচড্ বাথরুম সহ। ইকো'র প্রাঙ্গনে এখন সারা বছর জুড়ে থাকে নানা রঙের ফল-ফুলের সমাহার। শীতকালে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট হয়। সারাবছর ধরে ক্যারম খেলার ব্যবস্থা। দৈনিক রোগীর সংখ্যা প্রায় অর্ধশ'য়ের কাছাকাছি হচ্ছে। খুব জানতে ইচ্ছে করে ইকো নামক আজকের সুশোভিত বাগানের প্রথম দিককার মালীদের কথা কেউ মনে রেখেছে কিনা! আশা আছে, একদিন যাবো ইকো'তে। ইকো'র মঙ্গল কামনাকরছি। ডা. জামান ভাইয়ের চমৎকার লিডারশীপে ইকো'র আরো উন্নতি হোক এ প্রত্যাশাও করি। শেষ করবো Tao of Leadership নিয়ে কিছু পংক্তিমালা দিয়ে-

Go to the people
Live with them
Love them
Learn from them
Start with what they have
Build on what they know
But of the best leaders
When their task is accomplished
The work is done
The people will all say
We have done it ourselves

-Lao Tzu

ডা. এ. টি. এম. সানাউল বাশার
যক্ষা, সংক্রামক রোগ ও আরবান হেলথ বিশেষজ্ঞ
ইউএসএআইডি

বিশ্ববিদ্যালয়ের চোখে ইকো



একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্য সহায়তা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৯৯ সালে ইকো'র যাত্রা শুরু হয়। বাতজ্বর, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিস, প্রসূতি চিকিৎসা সেবা সহ ধুমপান তথা তামাক জাতীয় পণ্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ইকোর একটি রুটিন কাজে পরিনত হয়েছে। এছাড়া হাত ধোয়া, সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ানো, ভাইরাল ডিজেজ ইত্যাদি নিয়ে নিয়মিত মোটিভেশনাল সেমিনারের আয়োজন করা হয়ে থাকে। গত ২৪ মার্চ ২০১৮ খাদ্যে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণের ক্ষতিকর দিক, অসংক্রামক রোগ সমূহের কারনে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুকি এবং এসবের কারন ও প্রতিকারের বিষয় জানতে আমরা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস এর NCD I Community Medicine বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে একটি ছোট দল নিয়ে ইকো পরিদর্শনে আসি। কাক ডাকা ভোরে যাত্রা শুরু করে সড়কের দু'পাশের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এগুতে থাকে আমাদের দলটি।

অবশেষে প্রত্যাশিত সময়েই পৌঁছে যাই আমাদের মনজিলে মকসুদ ইকোর প্রাঙ্গণে। অত্যন্ত পরিপাটি, ছিমছাম পরিবেশ, সবুজের সমারোহ, আধুনিক স্থাপত্যকলায় নির্মিত ত্রিতল ভবন, ভবনের ভিতর বাহির উভয় দিকেই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ছাপলক্ষণীয়। ইকোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা খুবই আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের সকল তথ্য এবং এর কার্যক্রম বুঝিয়ে আমাদের পরিদর্শনের কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। এই দিনেই ইকোর প্রতিষ্ঠাতা ড. জামান সাহেব ইকো ওয়েব পেজ চালু করেন। আমরা ইকোর বিভিন্ন জনহিতকর ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক কাজের সাথে পরিচিত হয়ে যুগপৎ গর্বিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছি, যা আমাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে। বিস্তারিত জানতে একটি মাত্র দিন পর্যাপ্ত নয়, কারণ ইকো কমপেক্সটি আয়তনে ছোট হলেও এর অধিক্ষেত্র ছোট নয়। স্বাস্থ্যসেবার এক বিশাল জ্ঞানভান্ডার এই ইকো হাসপাতাল।

পলাশ চন্দ্র বণিক
সহকারী অধ্যাপক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস, ঢাকা।



তৃণমূলে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির পথিকৃৎ



আজ থেকে বিশ বছর আগে যখন ইকো প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকেই ইকোর একটি বিশেষ চরিত্রের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। সেটি হল, ইকো গ্রামীণ জনপদে সাধারণ চিকিৎসা সেবা দেওয়া দাতব্য চিকিৎসালয় গোছের কোন প্রতিষ্ঠান নয় বরং তারচেয়ে বেশী কিছু। প্রত্যন্ত এলাকায় আধুনিক ও যুগোপযোগী চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং গবেষণামূলক কর্মকান্ডেই ইকোর অধিক ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। Prevention is better than cure - এই আপ্তবাক্যকে সামনে রেখে রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যেই ইকো কাজ করে চলছে। ধুমপান, তামাক, জর্দা, গুল জাতীয় ক্ষতিকর অভ্যাস দূরীকরণে ইকো আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছে শুরু থেকেই। আশার কথা, এলাকায় তরুণদের মধ্যে এসব ক্ষতিকর বদ অভ্যাস দিনদিন কমে আসছে বহুলাংশে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুদের হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে ইকো এলাকার প্রতিটি স্কুলে সঠিক পন্থায় ও সঠিক সময়ে হাত ধোয়ার পদ্ধতি অনুশীলন করিয়েছে। আর এই নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রতিবার শৌচাগার ব্যবহারের পর ও খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সুদূরপ্রসারী সুফল হিসেবে ছোটখাটো পেটের পীড়া, খাবারে বদহজম, পরিপাকতন্ত্রে কৃমির উৎপাত ইত্যাদি সমস্যার সাথে সাথে আমাদের এখলাসপুর এলাকায় ডায়রিয়ায় আক্রান্তের হার তুলনামূলক কমে গেছে। মতলব আইসিডিডিআরবি রেকর্ড দেখলেই এই দাবীর সত্যতা প্রতিভাত হয়।

তাছাড়া সর্পদংশন, ডেংগি, চিকনগুনিয়া, জলাতঙ্ক ইত্যাদি গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে ইকো সচেতনতা ও গবেষণামূলক কাজ করে চলেছে। হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ নির্মূলে পাতে লবন খাওয়া, পরিমিত জীবনবোধ গড়ে তুলতেও ইকোর পরিশ্রম নিরলস। ডায়াবেটিস, স্ত্রী স্বাস্থ্য, প্রসূতি স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য ইত্যাদি সেবা ইকোতে সহজলভ্য ও চলমান।



নামেমাত্র মুল্যে ডায়াগনস্টিক সেবা ইকোর আরেকটি বিশাল অবদান।

আগামীতে ইকোর চিকিৎসা সেবার পরিসর বৃদ্ধির আশা করা হচ্ছে। আরো কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সেবা ইকোতে সংযোজন করার কথাবার্তা চলছে। কিন্তু তার জন্য দরকার বিশাল একটি তহবিল সৃষ্টি করা। ইকোকে টেকসই, চলমান, গতিশীল, যুগোপযোগী রাখতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আর্থিক নিরাপত্তা। আর তারজন্য চাই সমাজের হৃদয়বান এবং বিত্তশালী মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। সামাজিক এবং ধর্মীয় খাতে ব্যয়ের যে চিরাচরিত লাইন আমরা অনুসরণ করি তার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে ভাবতে হবে। অন্ন ও বস্ত্রের মতো চিকিৎসা সেবাও মানুষের মৌলিক চাহিদা। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্ন বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার চেয়ে তাদের চিকিৎসা সহায়তায় সাহায্য করাও কম সওয়াবের কাজ নয় - এটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

ইকো আজকে শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছে। আশা করছি এই কাজের মাধ্যমে ইকো একদিন এখলাসপুর এবং তদসংশ্লিষ্ট এলাকার সামাজিক স্বাস্থ্য বিনির্মাণে পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করে প্রভূত সুনাম বয়ে আনবে।

সরকার কবির উদ্দিন
প্রধান শিক্ষক
হাশিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আদর্শ গ্রাম ও স্কুল



এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো) এখলাসপুরের জনগনের স্বাস্থ্য সচেতন বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথে উদ্যোগে 'ইকো' এখলাসপুর গ্রামে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০১২ সনে মডেল ভিলেজ নামে ২ বছরের একটি প্রকল্প চালু করে। যেখানে আমরা প্রথমে একটি সার্ভে করি জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা সমন্ধে কতটুকু ধরনা আছে তাহা জানার জন্য। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এলাকার জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন পেশার লোকজনের সাথে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে বৈঠক করা শুরু করি। এছাড়া এই গ্রামের অন্তর্গত ৪টি সরকারী প্রাইমারী স্কুল এবং ১টি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে আমরা সচেতনতামূলক আলোচনা সভা করি।

আমরা তাদেরকে বলি যে, সংক্রামক ব্যাধি যেমন যক্ষা, হাম, কলেরা, বসন্ত, পোলিও, নিপা ভাইরাস এবং অসংক্রামক ব্যাধি যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিকস উভয়ই মানব জাতীর জন্য ভয়ংকর। সংক্রামক ব্যাধিতে একটি মানুষ মারা গেলে সমগ দেশে হইচই পড়ে যায় কিন্ত যক্ষা বা ক্যান্সারে একজন লোক মারা গেলে হয় না।

আমরা ধরেই নেই যে তার মরণব্যাধি হয়েছে সে মারা যাবেই। কিন্ত কিছু সাধারন অভ্যাস গড়ে তুললেই যে আমরা নিজেকে এই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি তাহা জানি না অথবা অজ্ঞতার কারনে বুঝতেই পারি না। আর সকলের জেনে রাখা যে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ একবার দেখা দিলে তাহা কখনোই নির্মুল হয় না। সারা জীবন এই ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রনে রেখেই বেঁচে থাকতে হবে। তার চেয়ে এই ভয়ংকর ব্যাধি যাতে না হয় তার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা ও সতর্কতাই সকল দিক থেকে মঙ্গলজনক। তাই খাবার খাওয়ার পূর্বে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া, পাতে আলগা লবণ না খাওয়া, ধুমপান ও সকল প্রকার তামাকজাতীয় দ্রব্যাদি ত্যাগ করা, টিউবওয়েলের পানি খাওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, নিয়মিত হাটার অভ্যাস গড়া, শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার মাধ্যমে আমরা উল্লেখিত মরণব্যাধি থেকে আমাদের দেহকে সুস্থ-সবল রাখতে পারি।

জীবনযাত্রার মান ও অভ্যাস পরিবর্তনের এই ধারাকে চলমান অবস্থায় ধরে রাখার জন্য সেন্টারের প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীগণ ও এলাকার জনসাধারনকে নিয়ে গঠিত কমিটির লোকজন সর্বদা সচেষ্ট রয়েছেন। আর এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একদিন সমগ্র



বাড়ি বাড়ি হাত ধোয়া দেখানো হচ্ছে।



স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাথে সচেতনতা সভা।

বাংলাদেশের মধ্যে এখলাসপুর গ্রামকে একটি রোল মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। আর এই অগ্রনী ভূমিকার পিছনে যে মানুষটি নিরবে নিভৃতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন তিনি আর কেউ নন এই 'ইকো'র প্রতিষ্ঠাতা এখলাসপুরেরই কৃতি সন্তান ড. মোঃ মোস্তফা জামান। যার ধ্যান-জ্ঞান এখলাসপুরের একটি মানুষও যেন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ না করে।

মাসুদ আহমেদ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়।

বাতজ্বর নিয়ন্ত্রণ



বাতজ্বর ও বাতজ্বর জনিত হৃদরোগ বাংলাদেশের শিশুকিশোরদের একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। অনেকেই এই রোগে ভুগে অকাল মৃত্যু বরণ করেন। বেঁচে থাকলে স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে পারে না। স্ট্রেপ নামের একপ্রকার জীবাণু মানুষের গলায় বাসা বাঁধতে পারে। গলার ঝিল্লির ভিতরে ঢুকে গলাব্যথা তৈরী করে। এর সাথে জ্বর থাকে। সাধারণত সর্দি-কাশি থাকে না। তাই শিশুকিশোরদের গলা ব্যথাকে অবহেলা করা যাবে না। এর চিকিৎসা নিতে হবে।

বাতজ্বরের লক্ষনসমূহ নিম্নরূপঃ

সাধারণত বড় বড় গিরায় ব্যথা বা ফোলা সহ জ্বর হয়। বুকে ব্যথা ও অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠা, অত্যাধিক ক্লান্তবোধ করা। হৃৎপিন্ডের ভাল্ব ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে রোগীর শ্বাস কষ্ট, বুক ধরফড় ও পায়ের পাতা ফুলে যেতে পারে। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগীতায় ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট এরং ইকোর যৌথ উদ্যোগে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এখলাসপুর, মোহনপুর ও জহিরাবাদ ইউনিয়নের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ১৬,০০৬ জন শিশু কিশোরদের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। রোগী খুঁজে বের করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং চিকিৎসা দেয়া হয়। প্রয়োজনে ঢাকায় হার্টের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এ সকল মোট ৮ জন বাতজ্বর ১১ জন বাতজ্বর জনিত হৃদরোগী সনাক্ত করা হয়। এই হিসাবে প্রতি হাজারে ১.২ জন এ ধরণের রুগী মতলবে বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুরে এবং দিনাজপুরের সদর উপজেলায় একই রকম তথ্য পাওয়া যায়। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে আশির দশকের তুলনায় বাংলাদেশে এই রোগের প্রকোপ কমে এসেছে। উন্নত দেশে এই রোগ এখন আর দেখা যায় না। আমরাও পারব বাংলাদেশ থেকে এই রোগকে বিদায় করতে। ইকো এই লক্ষে কাজ করছে।

বাতজ্বরের বহিঃ বিভাগীয় সেবাঃ

২০০২ সনের জুন মাসে বাতজ্বর ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ইকো বাতজ্বরের জন্য মতলব থানায় ব্যাপক পরিচিত লাভ করে। ড. মোঃ মোস্তফা জামান এবং ড. জসিম উদ্দিন যথাক্রমে প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবার বাতজ্বরের বিশেষায়িত সেবা দিয়ে আসছেন। এছাড়া অন্যান্য দিনও ইকোত বাতজ্বরের চিকিৎসা দেয়া হয়। প্রথম শুক্রবার মতলব উপজেলায় বাহিরের এলাকা থেকে রুগী আসেন। চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, দাউদকান্দি, কচুয়া এমনকি ভেদরগঞ্জ থেকে ও রোগী আসেন এখানে। এখানে চিকিৎসাকৃত রুগীদের একটি হিসাব নিচে দেওয়া হলো-

রোগের ধরণ	২০০৪ সাল	২০০৫ সাল	২০০৬ সাল	সর্বমোট
বাতজ্বর	৫৩	৩৩	২৪	১১০
বাতজ্বর জনিত হৃদরোগ	১০	১১	৭	২৮
মোট	৬৩	৪৪	৩১	১৩৮

এখানে লক্ষণীয় যে "বাত" কে বাতজ্বর বলে অনেকেই ভুল চিকিৎসা পেয়ে আসছেন। রুগীদের মাঝেও এ বিষয়ে ভুল ধারনা রয়েছে। তাই যারা এখনে বাতজ্বরের চিকিৎসার জন্য আসেন তার সিংহ ভাগই অন্যান্য বাতে ভুগে থাকেন। এমনকি কারো কারো আদৌ কোন রোগই নেই। অথচ চিকিৎসা পাচ্ছেন বছরের পর বছর। সুতরাং এ অবস্থার সার্বিক পরিবর্তন করা ইকোর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ড. মোঃ মোস্তফা জামান
প্রতিষ্ঠাতা, ইকো

মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা



পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উন্নয়ন কর্মকান্ডর পাশাপাশি সন্তান ধারন ও লালন-পালনে মহিলাদের ভূমিকা অতুলনীয়। গর্ভাবস্থায় মা যদি অপুষ্টিতে ভোগেন বা রোগ শোকে ভোগেন, গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হয়। গবেষনায় দেখা গেছে অনেক রোগের বীজ বপন হয় মায়ের পেটেই। রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে একটু বড় হওয়ার পর। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় মাতৃ গর্ভে অপুষ্টি থাকলে প্রাপ্ত বয়স্ক জীবনে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ হওয়ার সম্ভবনা বেশী থাকে। এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে গর্ভকালীন মায়ের স্বাস্থ্য এবং গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ অনুন্নত কিংবা স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে মাতৃ স্বাস্থ্য অবহেলিত। অনেক মহিলাই গর্ভকালীন অপুষ্টিতে ভোগেন। অনেকেই সন্তান জন্মদানের সময় বা এ সংক্রান্ত জটিলতায় মারা যান। একটি পরিবারে বিশেষ ভূমিষ্ট সন্তানের উপর এর প্রভাব সহজেই অনুমেয়। বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার এখনো অসহনীয় পর্যায়ে আছে। এখলাসপুরের এই হার ছিল আরো বেশী। কারন হচ্ছে খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারনে এর পশ্চাতপদতা। ইচ্ছা থাকলেও প্রসবের জন্য গর্ভবতীকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। অনেকের সামর্থ ছিল না একেবারেই। তাদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে ইকো মাতৃস্বাস্থ্য কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের প্রধান সেবা সমূহ নিম্নরূপঃ

* বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভবতীদের সনাক্ত করা।
* ইকোতে নিয়ে এসে রক্তচাপ, প্রশ্রাব ও রক্ত পরীক্ষা সহ সকল প্রয়োজনীয় চেকআপ করা।
* ধনুষ্টংকার টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
* ঝুঁকিপূর্ণ ডেলিভারী সনাক্ত করা এবং শহরের হাসপাতালে প্রেরণ করা।
* খাদ্য ও পরিশ্রম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করা।
* সাদাপাতা, জর্দ্দা সহ অন্যান্য তামাক বর্জনের জন্য উপদেশ দেয়া।
* রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য ঔষধ প্রদান করা।
* নিরাপদ প্রসবের জন্য মা-শ্বাশুড়ী সহ দাইয়ের সাথে শলা পরামর্শ করা।



গত বছর গর্ভবতী মায়েদের জন্য একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ত্রিশ জন গর্ভবতী এতে অংশ গ্রহন করেন। এদের পরামর্শ ও চিকিৎসা প্রদান করেন ডাঃ আয়েশা বেগম ও ডাঃ কাওসার পারভীন। অনুষ্ঠান শেষে সকলের মাঝে ফল বিতরণ করা হয়। সকলকে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও প্রদান করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ সংক্রান্ত সকল সেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়ে থাকে। শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উপর কাজ করার জন্য ইকো একজন স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ দেয়। তাকে এ বিষয়ে মতলব ও নারায়ণগঞ্জে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইকো ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম আরো জোরদার করবে। পাশাপাশি এলাকাবাসীর ও উচিত হবে এ সেবার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা। আসুন আমরা সবাই মিলে মাতৃ মৃত্যুকে প্রতিহত করি।

ডাঃ কাওসার পারভীন

ইকো এবং আমরা



ইকো (ECOH – Ekhlaspur Center of Health) একটি সেবাধর্মী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। এতদ্অঞ্চলে (মতলব উত্তর, চাঁদপুর) স্বাস্থ্য সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে ১৯৯৯ সাল থেকে। যিনি ইকোর স্বপ্নদ্রষ্টা, রূপকার তিনি আর কেউ নন, এখলাসপুরের কৃতি সন্তান ড. মোস্তফা জামান। তিনি বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানী, গবেষক-বিশেষজ্ঞ থেকে নীতি নির্ধারক। বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় কর্মরত। বাতজ্বর বিশেষজ্ঞ ড. জামানের সহ্যধর্মিনী ডাঃ কাওসার পারভীন ও ইকোর সাথে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। এছাড়া জাপানী নাগরিক মিসাও তাঁর কয়েকজন বন্ধু (ECSA) ইকোর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইকোর সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। যাদের আর্থিক অনুদান ইকোকে দিয়েছে পথের সন্ধান। কৃতজ্ঞতা মিসাও ইয়ানোর প্রতি।

গত দশকে দেশের স্বাস্থ্য সেবার যে অগ্রগতি হয়েছে তার ছোঁয়া প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায়ও হয়েছে। ইকো তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ, উৎকৃষ্ট মডেল। ইকোর স্বাস্থ্য সেবায় অত্র এলাকার জনগণকে করেছে বিমুগ্ধ। ফলে এলাকায় বেড়েছে স্বাস্থ্য সচেতনতা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার। প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়েছে প্রসূতি মা ও শিশু স্বাস্থ্যের। একটা শিশুর জন্ম হয় নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এবং গর্ভকালীন সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে শিশু ভূমিষ্ট হবার পর থেকে সেবা পান ইকো থেকে। এ'হেন ইকোর ভূমিকা ও কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করেছে এখলাসপুরবাসীকে তথা এতদ্অঞ্চলের জনগণকে।

প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবা তো রয়েছেই ইকোতে। সার্বক্ষনিক এমবিবিএস ডাক্তার ডাঃ মাহবুবুস সোবহান কে ইকোতে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেই প্রতি শুক্রবার ডাক্তার আসেন মাসের ১ম শুক্রবার, ২য় শুক্রবার বসেন ডাঃ সরকার মোঃ নোমান, তৃতীয় শুক্রবার ডাঃ জসিম উদ্দিন আহম্মদ এবং ৪র্থ শুক্রবার ডাঃ মোঃ সাদেকুল ইসলাম ও চার মাস অন্তর মাসের ৫ম শুক্রবার বসেন ডাঃ সোহেল রেজা চৌধুরী। স্বজনপ্রীতির উর্দ্ধে থেকে সিরিয়াল অনুযায়ী রোগী দেখে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন ডাক্তারগণ। প্রয়োজনে ইকো ল্যাব. থেকে নামমাত্র ফি'র মাধ্যমে মলমূত্র, রক্তও পরীক্ষা করা হয়।

যা এলাকাবাসীর জন্য গর্বের বিষয়। ইকো'র প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ আরিফুর রহমান খাঁন গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভকালীন সময়ের চেকআপ করে থাকেন। তাকে সহযোগীতা প্রদান করে থাকেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দু'জন মহিলা কর্মী। ইকো ICDDRB-র যৌথ উদ্যোগে ৫ বছরের কম বয়নী শিশুদের দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা। চলছে বাতজ্বর রোগীদের সনাক্তকরণ সার্ভে।

উল্লেখ্য যে, ইকোর উদ্যোগে ইতোমধ্যে হার্ট ক্যাম্প, বাতজ্বর চিকিৎসা ক্যাম্প ও উচ্চরক্তচাপের ক্যাম্প ইত্যাদির মাধ্যমে অত্র এলাকার (মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিন) জনগণকে বিশেষ চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। যেখানে চিকিৎসা প্রদান করেন দেশে নামী দামী চিকিৎসকবৃন্দ। অতি সম্প্রতি ছোট খাট অপারেশনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ইকোতে। ইকো সামাজিক আন্দোলনেও অংশ নিচ্ছে।

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবসে (৩১ মে) ২০০৪ ও ২০০৫ সালে ধুমপানমুক্ত অভিযানের অংশ হিসাবে র‍্যালীর ব্যবস্থা করেছে ইকো। সমাবেশে ডাক্তারবৃন্দ ধুমপানের কুফল বর্ণনা করেছেন উপস্থিত ধুমপায়ীদের সামনে। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছে কতিপয় ধুমপায়ীদের। ধুমপান বিরোধী পোষ্টার, লিফলেটও বিতরণ করা হয়েছে। এতদ্অঞ্চলের লোকজন এখন এ বিষয়ে খুবই সচেতন এবং তারা আইনকে সম্মান করেন। ধুমপায়ীর সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। ইকো এমনি সমাজ বদলের ভূমিকা রেখে চলেছে। গরীব মানুষের হাসপাতাল ইকো। যাদের ভাষা সাবলীল নয়, আচার আচরনে যারা সরল, যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই শহরে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার, তাদেরই হাসপাতাল ইকো। বাতজ্বরের জন্য বিশেষ হাসপাতাল ইকোতে সেবা নেওয়ার জন্য সুদূর কচুয়া, মতলব দক্ষিন, দাউদকান্দি থেকেও রোগী আসে। মানসম্মত চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফেরেন কাঙ্খিত সেবা গ্রহণকারীগণ। অদূর ভবিষ্যতে ইকো একটা নামী-দামী হাসপাতাল হিসেবে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এমনটাই প্রত্যাশা এলাকাবাসী ও বিশেষজ্ঞ মহলের। জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচালিত ইকো গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এমনটিই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন অভিজ্ঞ মহল।

মোঃ আলাউদ্দিন
ব্যাংকার

মিসাতো ও এখলাসপুরের সেতু বন্ধন



বিশ্বায়ন বলতে আমরা প্রাথমিক ভাবে দেশের সীমারেখা পেরিয়ে মূলধন, দ্রব্য এবং সেবার অবাধ চলাচলকে বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু এই সব বস্তু বা সেবার সাথে সাথে ব্যবসা চাকুরী কিংবা উচ্চ শিক্ষার তাগিদে দেশের সীমানা পেরিয়ে মানুষের বিদেশে যাবার সুযোগ এবং প্রবনতা বেড়ে চলছে। পিএইচ.ডি. গবেষনার জন্য আমাকেও বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে যেতে হয়েছিল সুদূর জাপানে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান টোকিও শহরের একবারে কেন্দ্রে হলেও স্বপরিবারে বাস করার সুবিধার্থে বেছে নেই টোকিও থেকে ট্রেনে ঘন্টাখানেকের দূরত্বের একটি ছোট শহর- যার নাম 'মিসাতো'। জাপানী ভাষায় 'মি' অক্ষর/শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'তিন' এবং সাতো অক্ষর/শব্দটির অর্থ মানে হচ্ছে 'গ্রাম'। এক সময়কার তিনটি গ্রাম এক সাথে মিলে গড়ে উঠেছে এই মিসাতো শহর- তাই এই নামকরণ। মিসাতো শহরটিতে বাস করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন/গবেষনারত বাংলাদেশী সহ অনেক বিদেশী। বিভিন্ন উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে গড়ে উঠে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী এবং জাপানীদের সুসম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব। এখলাসপুর গ্রামে স্বাস্থ্য সেবায় নিবেদিত "এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ" হচ্ছে মিসাতো শহরের জাপানী এবং বাংলাদেশীদের মধ্যে গড়ে উঠা এ রকম বন্ধুত্বেরই নিদর্শন।

ইকো প্রতিষ্ঠায় মিসাতো শহরের জাপানীদের উদ্যোগ থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটা খুব কাছ থেকে দেখা তাতে অংশ গ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকেই এ লেখা। প্রথমেই বলতে হয় যে, এ স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় ধারণার জন্ম সমন্ধে। এখলাসপুর গ্রামের কৃতি সন্তন, ঐ গ্রামেরই স্কুলে পড়া আজকের সুপ্রতিষ্ঠিত নামী চিকিৎসক ড. মোস্তফা জামানের একজন ভালো চিকিৎসক হবার পাশাপাশি স্বপ্ন ছিল নিজের গ্রামের মানুষের জন্য কিছু করা একজন ডাক্তার হিসাবে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এখলাসপুরের গ্রামবাসীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার এক পরিকল্পনা গ্রহন করেন। আর এর বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন মিসাতো শহরের MIC (Misato International Community) এর নেতৃত্বদানকারী এবং মিসাতো শহরের বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্রিয় মিঃ মিসাও ইয়ানো। বস্তুতঃ এই মিঃ ইয়ানো এবং ডা. মোস্তফা জামানের যৌথ উদ্যোগের ফসলই হচ্ছে ইকো। এখানে MIC সমন্ধে কিছুটা ধারণা দেয়া দরকার কারন এই MIC এর জাপানী সদস্যরাই সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব করেছেন এখলাসপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।

যাহোক MIC এর প্রধান কাজ হচ্ছে মিসাতো শহরে বসবাসকারী বিদেশীদের জীবন নানা রকম সহযোগিতা প্রদান করা। বিদেশী বিশেষ করে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের যারা শুধুমাত্র ৩/৪ বছরের জন্য জাপানে অবস্থান করে তাদের পক্ষে ব্যয়বহুল জাপানে আসবাবপত্র ইত্যাদি কেনা অনেকটা দুঃসাধ্য। আর MIC সব বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ার টেবিল থেকে টেলিভিশন ফ্রিজ সবই যোগান দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়। জাপানী ভাষা না জানার কারনে উদ্ভুত সমস্যা থেকে শুরু করে অসুস্থ্যতা ও নানা পারিবারিক সমস্যা সমাধানে তাদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং ভ্রমণের আয়োজন করে প্রবাসের জীবনকে আনন্দময় করে তুলে।

যাহোক, ড. মোস্তফা জামান, আমাদের শ্রদ্ধেয় জামান ভাই- এর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে মিঃ ইয়ানো এবং অন্যান্য সবাই মিলে কাজ শুরু করে দেয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার। এর পর অনেকগুলো বৈঠকে চুড়ান্ত করা হয় কর্ম পরিকল্পনা। স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেন জামান ভাই ও তাঁর দাদার ওয়ারিশগন। ১৯৯৭ এর জুলাই মাসে সরেজমিনে সব কিছু দেখার জন্য প্রথমবারের মত বাংলাদেশে আসেন মিঃ ইয়ানো এবং সঙ্গে মিঃ নাকাইয়ামা। ফিরে গিয়েই শুরু করেন সব থেকে কঠিন কাজ অর্থসংগ্রহ করা। জাপান বলতেই আমরা একটা অত্যন্ত ধনী দেশ বুঝে থাকি। সে কারনে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, কোন এক জন বা কয়েকজনের জমে থাকা অর্থের যোগানেই বোধ হয় গড়ে তোলা হয়েছে এ স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তাই এই অর্থ সংগ্রহের কষ্টকর ব্যাপারটির কথা সবার জানা দরকার। একবারে নয়, একটি একটি ইয়েন করে সংগ্রহ করা হয়েছে ইকো জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ। অর্থ সংগ্রহে সব থেকে বেশী যে কাজটি করা হয়েছিল তা হচ্ছে বিশেষ "বাজার" এর মাধ্যমে। জাপানে "বাজার" হচ্ছে আমাদের দেশের 'মেলার' মত অনেকটা। সেখানে নতুন পুরান বিশেষ করে পুরান জিনিসের বেঁচা কেনা হয় এবং নানা ধরনের খাবার জিনিসও বিক্রি করা হয়। MIC এর সদস্যরা নিজেদের এবং অন্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা জামা-কাপড় ইত্যাদি এই বাজারে বিক্রি করছে। বাজারে বিক্রি করছে 'ওমোচি'- এক ধরনের পিঠা জাতীয় খাবার যা তৈরী করতে বিশাল এক কাঠের হাতুরী দিয়ে চালকে অনবরত আঘাত করে প্রস্তুত করতে হয় 'মন্ড'।

আবার সারারাত ধরে বাংলাদেশী খাবার রান্না করে পরদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত জাপানীদের সাথে হাঁক ছেড়ে তা বিক্রি করেও অর্থ যোগাড় করেছি আমরা। এছাড়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট অর্থ দান করেছেন বেশ কিছু স্থানীয় জাপানী। আবার মিঃ ইয়ানোর'র আবেদনে সাইতামা প্রিফেকচার সরকারও কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছিল। মিঃ ইয়ানো তার নিজের একটি বিখ্যাত রেষ্টুরেন্টের অতিথিদের কাছ থেকেও সংগ্রহ করেছেন অর্থ। নানাভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে ইকোর অর্থ। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়েছে তার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা অনেকটাই অসম্ভব। তবে তার বিষয়টির উল্লেখ করার একটাই কারন যে, আমাদের আজকের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পেছনে রয়েছে অসংখ্য ভালবাসা একদেশের মানুষেরে অচেনা অন্য দেশের মানুষের জন্য। একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়টি ছিল শুধুমাত্র সরকারের এক্তিয়ারাধীন। কিন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার এবং বিশ্বায়নের কারনে এখন একদেশের মানুষের সাথে আর এক দেশের মানুষের বন্ধন সরাসরি নিজেরাই তৈরী করছে। আর তার একটি বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে ইকো। এটি আজ মিসাতো শহর এবং এখলাসপুর গ্রামের সেতু বন্ধন।



জাপানে এক অর্থসংগ্রহ সভায় তুষার কান্তি দাস ও মোস্তফা জামান : ১৯৯৭

অর্থ সংগ্রহের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কেন্দ্রটি নির্মাণ করা এবং তারপর সুষ্ঠুভাবে এবং পরিকল্পনা মাফিক এর স্বাস্থ্যসেবার কাজ শুরু করা। নির্মাণ কাজটি ধাপে ধাপে এবং সরাসরি তত্ত্বাবধানে শেষ করার একক কৃতিত্ব ড. মোস্তফা জামানের। এছাড়া, উদ্বোধনের পর থেকে ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের মাধ্যমে এটি পরিচালনার দায়িত্বভারও পড়ে ডাঃ মোস্তফা জামানের উপর।

ডাঃ জামান, এখলাসপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র যার স্বপ্নের বাস্তবায়ন, নিজের শ্রম, সময়, মেধা এবং সর্বোপরি আন্তরিকতা দিয়ে পরিচালনা করে আসছেন এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে ড. জামান তার নিজ গ্রামের মানুষের জন্য যে অবদান রেখেছেন তা নিশ্চয়ই মনে রাখার মত। তবে এর অব্যাহত পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন ও পরিধি অধিকতর বিস্তৃত করার জন্য প্রয়োজন সবার বিশেষ করে এখলাসপুর বাসীর সহযোগীতা। আমাদের জাপানী বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম পথই হচ্ছে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অগ্রযাত্রার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাওয়া। একজন বাংলাদেশী হিসেবে আমিও শুধুমাত্র এর সফলতাই কামনা করিনা সাম্ভাব্য সবধরনের সহযোগীতার জন্য রইলাম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডঃ তুষার কান্তি দাস
শিক্ষক
আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গরীবের বন্ধু 'ইকো'



শিক্ষা, সংস্কৃতি আর খেলাধুলায় ভরপুর ঐতিহ্যবাহী এখলাসপুর ইউনিয়ন। মতলব উত্তরের নদী বিধৌত এ ইউনিয়নে জন্ম নেন এ এলাকার সূর্যসন্তান তথা চাঁদপুরের অহংকার এবং এখলাসপুরের দরিদ্র, খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের বন্ধু জনাব ডক্টর মোস্তফা জামান। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও গভীর দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ স্বরুপ ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'এখলাসপুর সেন্টার অফ হেল্‌থ' তথা 'ইকো'।

গ্রামের নিতান্ত প্রান্তিক হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করতে ও তাদের দোরগোড়ায় তা পৌঁছে দিতে ইকো সদা তৎপর রয়েছে যাত্রা লগ্ন থেকেই, যা অত্র এলাকা তথা সমগ্র দেশের জন্য এক অনুসরণীয় মডেল। বহিঃবিভাগে রোগী দেখা, গর্ভবতী মায়েদের চেক-আপ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস ক্লিনিক সেবা, পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের সরকারি টিকাদানে সহায়তা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপ, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরিসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে দুর্বার গতিতে। এসব সেবা ইকোতে অতি সহজে পাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষকে এখন আর কষ্ট করে রাজধানী ঢাকা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে যেতে হয়না। এতে করে অর্থ ও সময়, দুই-ই বেঁচে যায়। এছাড়াও দূর-দুরান্ত থেকে অনেকেই ইকো তে আসেন সেবা নিতে, যা সর্বজন পরিলক্ষিত। ইকো'র কয়েকটি উপকারিতা না বললেই নয়- ক) ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই ইকো'র চোখে সমান, যা আমাকে বিমোহিত করেছে বারংবার; খ) প্রায়সই ফ্রি ঔষধ, ফ্রি চেক-আপ, স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর বিশেষ পরামর্শ প্রদান এবং গ) মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষে গর্ভবর্তী মায়েদেরকে নিয়মিত ফ্রি পরীক্ষা নীরিক্ষা ও ঔষধ প্রদান।

পরিশেষে আমি ইকোতে যে সকল চিকিৎসকগণ নিয়মিত সেবা দিয়ে আসছেন, তাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও দোয়া করছি যেন তারা এর উত্তম প্রতিদান পান।

আব্দুল্লাহ আল মামুন



ইকোতে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস ২০০৮ উদযাপনের দৃশ্য

প্রারম্ভিক ঘটনাপঞ্জি

জানুয়ারী ১৯৯৭--

--ডা. মোঃ মোস্তফা জামানের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিল এখলাসপুরে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর। জাপানে অবস্থানকালীন তারই একান্ত ঘনিষ্ঠজন জনাব মিসাও ইয়ানোর কাছে সহযোগীতার অনুরোধ করার পর তিনি আশ্বাস দেন।



জুলাই ১৯৯৭--

--ডা. মোঃ মোস্তফা জামান, জনাব মিসাও ইয়ানো এবং জনাব নাকাইয়ামা সরেজমিনে এখলাসপুর পরিদর্শন করেন। জাপান ফেরৎ গিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। তাদের সক্রিয় সহযোগীতা করেন ডাঃ কাওসার পারভীন, ডঃ তুষার কান্তি দাস এবং কয়েকজন জাপানী।



১২ নভেম্বর ১৯৯৮--

--ইকোর জন্য জমি দান করেন জনাব আকফৎ আলী প্রধানীয়া, তাইজুদ্দিন প্রধানীয়া, আবদুস সোবহান প্রধানীয়া, দেলোয়ার হোসেন প্রধানীয়া, রুহুল আমিন প্রধানীয়া, ডা. মোঃ মোস্তফা জামান, মোঃ ইলিয়াছ প্রধানীয়া।

২৪ নভেম্বর ১৯৯৮--

--ইকোর দালানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডা. মোঃ মোস্তফা জামান ও জনাব মিসাও ইয়ানো।



৩১ মার্চ ১৯৯৯--

--জনসংখ্যা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সার্ভে শুরু।



৮ মে ১৯৯৯--

--ইকো'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনঃ

প্রধান অতিথিঃ জনাব কজি তমিতা, দ্বিতীয় সচিব, জাপানী দূতাবাস, ঢাকা।

--বিশেষ অতিথিঃ জনাব মিসাও ইয়ানো, মিসাতো, জাপান।



বর্হিবিভাগে রোগী দেখা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু। পালাক্রমে প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার ডা. মোঃ মোস্তফা জামান, দ্বিতীয় শুক্রবার ডাঃ জসিম উদ্দিন, তৃতীয় শুক্রবার ডাঃ সরকার মোঃ নোমান ও চতুর্থ শুক্রবার ডাঃ মোঃ সাদেকুল ইসলাম।
১৯৯৯-২০০১ মেয়াদের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন

১৫ নভেম্বর ২০০০--
--দ্বিবার্ষিক সাধারন সভা ২০০০
--হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ ও বহুমূত্র বিষয়ক সার্ভে শুরু। অন্যান্যদের সাথে অংশগ্রহণ করেন ডাঃ সোহেল রেজা চৌধুরী, ডাঃ নবও ইযোশিইকে, ডাঃ মিউরা, ডাঃ শজি, ডাঃ অইয়োশি।

১ ডিসেম্বর ২০০০--
--ডাঃ শেখ মোঃ মামুনুর রশীদের প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে যোগদান (ইস্তফা ৩১.১২.২০০১)।

১ জুলাই ২০০১--
--আনুষ্ঠানিক বিদ্যুৎ সংযোগ, এর আগে ডা. মোস্তফা জামানের বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো।

৪ জানুয়ারী ২০০২--
--বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০১।
--২০০২-২০০৪ মেয়াদের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন।

১০ মার্চ ২০০২--
--ডাঃ এটিএম সানাউল বাশারের প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে যোগদান (ইস্তফা- ১৩.০৯.২০০২)।

২৪ জুন ২০০২--
--বাতজ্বর ক্যাম্প ও স্মরনিকা প্রকাশ প্রধান অতিথিঃ এম এম মঞ্জুর হাসান, বিশেষ অতিথিঃ জনাব মিশাও ইয়ানে।



৪ অক্টোবর ২০০২--
--সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে দ্বিতীয় তলার নির্মান কাজ শুরু।
--কাজের উদ্বোধন করেন ডা. মোঃ মোস্তফা জামান ও ডাঃ জসিম উদ্দিন আহমেদ।

২৫ ডিসেম্বর ২০০২--
--হার্ট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়, অতিথিঃ এম এ হান্নান, যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়, প্রফেসর কে এম এইচ সিরাজুল হক, লায়ন বেনজীর আহমেদ, মমতাজ হোসেন, ডাঃ জিএম ফরুক, ডাঃ মঞ্জুর হাসান ও ডাঃ খালেদ মহসিন



৯ জানুয়ারী ২০০৪--
--ডাঃ ফেরদৌস হাকিম এর মেডিকেল অফিসার হিসাবে যোগদান (ইস্তফা- ১৩.০৮.২০০৪)।

১২ মার্চ ২০০৪--
--উচ্চ রক্তচাপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়
--অন্যান্যের মধ্যে বিশেষজ্ঞ ডাঃ সত্যবতী হান্না, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, এর অংশ গ্রহণ



১ জানুয়ারী ২০০৫--
--ওয়েব সাইট চালুঃ www.ecohbd.org
--ড. কউন তায়ে বং কউন (কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশান এজেন্সী) এর ইকো পরিদর্শন
--ডাঃ শেখ মোঃ মাহবুবুস সোবহান এর মেডিকেল অফিসার হিসাবে যোগদান (ইস্তফা- ৩১.০৩.২০০৬)

২২ জুন ২০০৬--
--বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস পালন। ইকো, এখলাসপুর ইউনিয়ন কাউন্সিল, এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়, এখলাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ধুমপান মুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষনা করা।

২০০৬--
--বাতজ্বর ও বাতজ্বর জনিত সার্ভে অনুষ্ঠিত
--অসংক্রামক ব্যাধি সার্ভে অনুষ্ঠিত। তামাক বিরোধী জোট ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগীতা

৩ মার্চ ২০০৭--
--এখলাসপুর বাজারে ধুমপান ঘর তৈরী করা হয়, জায়গা দেন জনাব ওয়ালী উল্লা।

১ জুন ২০০৭--
--সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে তৃতীয় তলার নির্মাণ কাজ শুরু।

৩ অক্টোবর ২০০৭--
--এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মেইন গেটে ধুমপান মুক্ত সাইনবোর্ড।

৯ জুলাই ২০০৮--
--তামাক নিয়ন্ত্রণে মতলব উত্তর উপজেলার ছয় ইউনিয়নের স্বাস্থ্য কর্মিদের নিয়ে সভা।

২৪ জুলাই ২০০৮--
--বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের তামাক নিয়ন্ত্রন বিষয়ক উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমানের ইকো পরিদর্শণ।



৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৯--
--স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ এম এ ফয়েজ মহোদয়ের ইকো পরিদর্শন।

১৭ এপ্রিল ২০০৯--
--তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের ইকো পরিদর্শনঃ ড. স্টিভেন এ তামলিন, জন হপকিনস স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ইউএসএ। মিস গিম ভেস্তাল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জেনেভা।



ইকোর সামনে ড. স্টিভেন এ তাম্পলিন ও মিস জেম্মা ভেস্তাল (ডান দিক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়)

৪ আগস্ট ২০০৯--
--বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে তিন ইউনিয়নের স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে সভা। প্রধান অতিথি চাঁদপুর জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ, বিশেষ অতিথি মতলব উত্তর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ এম এ মান্নান।

২৮ ডিসেম্বর ২০০৯--
--তামাক বিরোধী যুব-সমাবেশ। দি ইউনিয়নের টেকনিকেল এ্যাডভাইজার ড. আকরামুল ইসলামের প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ।

২০১০--
--বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিনপূর্ব এশিয়া অঞ্চলের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. নিও নিও চ্যাং এর ইকো পরিদর্শন।



ড. নিও নিও চ্যাং

ছবি কথা বলে



জাতীয় শোক দিবস, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে ইকো আয়োজিত বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ ক্যাম্পেইন



আধুনিক পালস অক্সিমিটারের মাধ্যমে রোগীর রক্তে অক্সিজেনের পরিমান নির্ণয় করছেন ইকোর স্বাস্থ্যকর্মী



ইকো আয়োজিত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের মাঝে ড. মোস্তফা জামান ও চেয়ারম্যান জনাব মোসাদ্দেক হোসেন মুরাদ



ইকোর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ (১১ সেপ্টেম্বর,২০২০)



ইকোতে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৬ উদযাপনের দৃশ্য। রোগী দেখছেন ডা. সাদেকুল ইসলাম ও ডা. সরকার মোঃ নোমান।



উঠান বৈঠকে হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম দেখাচ্ছেন ইকোর স্বাস্থ্যকর্মী



বিশ্বব্যাপী করোনা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় বাংলাদেশে প্রথম রোগী সনাক্ত হবার পূর্বেই ইকো আয়োজন করেছিলো করোনা সচেতনতা সভা।



করোনাকালীন সময়ে হাত ধোয়ার উপর বিশ্বব্যাপী জোর দেয়া হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ইকোর প্রবেশপথে বেসিন স্থাপন করা হয়।

শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি যাদের



মিসাঅ ইয়ানো (ডানে)

(মৃত্যু : ১১ জানুয়ারি ২০১৯)

- ইকো প্রতিষ্ঠায় তহবিল সংগ্রহে মূল ভূমিকা রেখেছেন। সে টাকায় ইকোর এক তলা দালান তৈরি হয়েছে। তার মৃত্যুতেতে এখলাসপুরের সর্বস্তরের জনগন শোক প্রকাশ করেছে। ফেসবুকে প্রকাশিত একটি মন্তব্য তুলে ধরা হলোঃ

মোসাদ্দেক হোসেন মুরাদ (চেয়ারম্যান, এখলাস-পুর ইউনিয়ন): মিসাঅ ইয়ানো পরলোক গমন করেছেন শুনে খুব দুঃখ পেয়েছি। আমার সাথে উনার দেখা হয়েছিলো ইকোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। অন্যদের সাথে আমার গলায় ও স্কার্ফ পরিয়ে দিয়েছিলেন। ইকো প্রতিষ্ঠায় উনার অবদান অতুলনীয়। ইকো তথা এখলাসপুরবাসি এক অকৃত্রিম বন্ধুকে হারালো।



মোয়াল্লেমুল ইসলাম (মালুম মাস্টার)

(মৃত্যু : ২২ আগস্ট ২০২০)

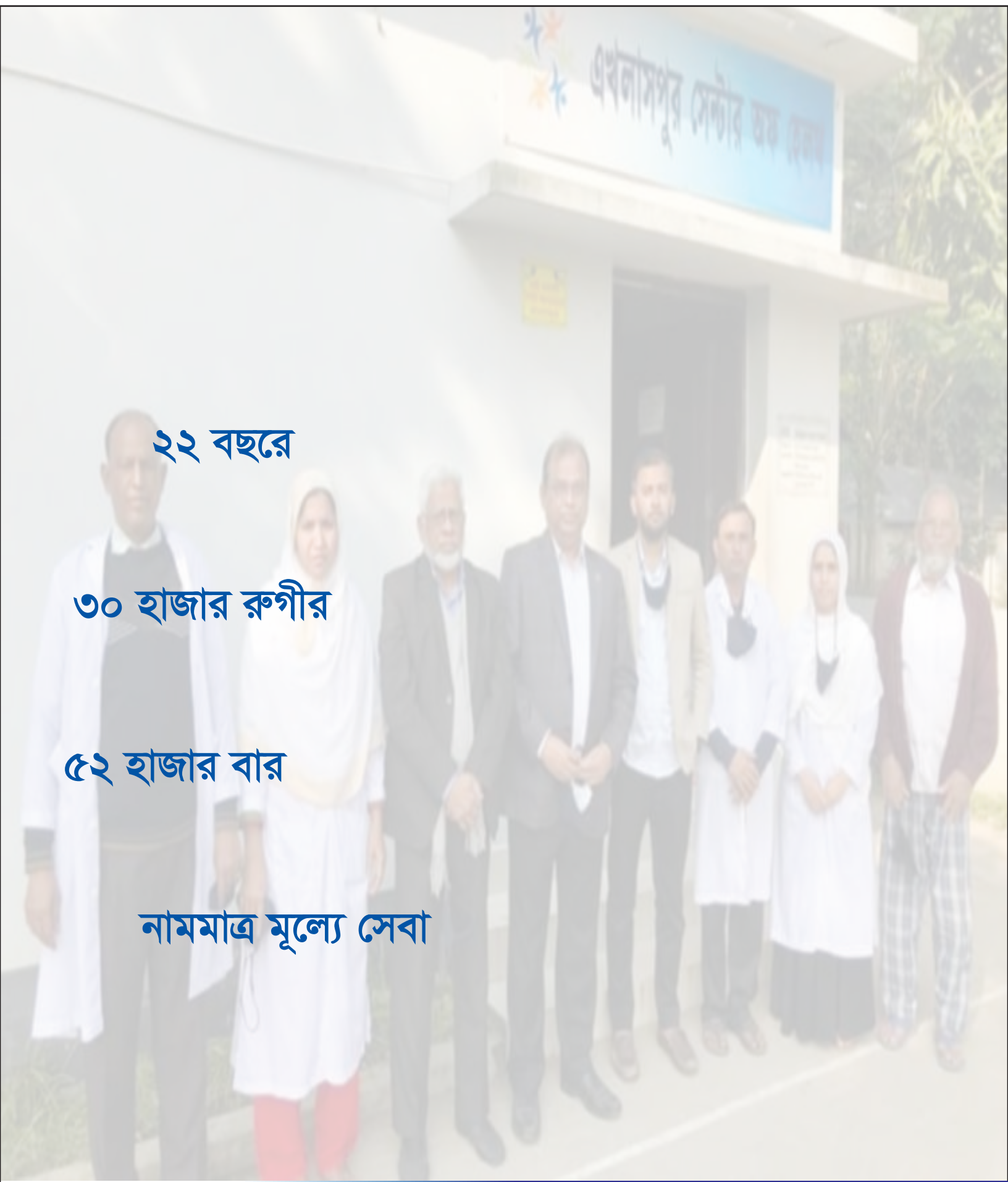
- ইকো প্রতিষ্ঠায় জনসংহতি সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।
- ইকোর প্রথম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি



বোরহান উদ্দিন

(মৃত্যু : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮)

- ইকোর দাতা সদস্য
- ইকোর সামাজিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন



২২ বছরে

৩০ হাজার রুগীর

৫২ হাজার বার

নামমাত্র মূল্যে সেবা

ECOH